দুই-ধারা

EAST WIND : WEST WIND

দুই-ধারা

(পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)

পার্ল এস বাক্

অনুবাদ—অশোক গুহ

[illegible]—৩২এ, খেলাত বাবু লেন, কলিকাতা—২

১ম প্রকাশ
মহালয়া—১৩৫৯ সাল

একমাত্র পরিবেশক—পি. রায়চৌধুরী
১১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা মাত্র

৩২/এ, খেলাত বাবুর লেন, কলিকাতা, শিক্ষাসত্রের পক্ষ হইতে শ্রীঅমু ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১০৪, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা, নবগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রাচ্য প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য,
দু'য়ে কখনো মিল হবে না—

একদা একথা গলাবাজির জোরে জাহির করা হয়েছিল। তার আড়ালে ছিল মারমুখো স্বাজাত্যবোধ—সাদা আর কালোর পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর সাবেকি সংস্কার। দুয়ের বিরোধ তখন শুরু হয়ে গেছে এশিয়ার ঔপনিবেশিক মঞ্চে—সংঘাত বেঁধেছে। সে-সংঘাতে যেমন একদিকে ঐতিহাসিক প্রগতিবাদী ভূমিকা ছিল, অন্য দিকে ছিল শ্রেণী স্বার্থের পাকচক্র। তাই প্রাগগ্রসরতার ঢেউ এল, জলায় আনলে জোয়ার—আবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশের বানও ডাকলো। দেশের সম্পদের সর্বনাশ তো বটেই। আরো এক আপদ এল। কালা বা পীত রং এশিয়ার মানুষের চামড়া থেকে ধুয়ে গেল না টেউয়ে, মুছে গেল না 'নেটিভ', 'নিগার' খেতাব, তবু স্বদেশী সত্তা লুপ্ত হোলো, এল উৎকট ফিরিঙ্গিয়ানা। ভাবধারার পলিমাটি যাদের মনে পড়েছিল, তারা নতুন ফসল ফলালেন দেশের মাটিতে, কিন্তু সে তো ক'জন। বেশির ভাগ ভুললেন ফেরঙ্গ বা ইয়াঙ্কি গিলটি দেখে—ভেকও ধরলেন। কাসি আর হাসি নকল করেই তারা খুশি। যাঁরা দুই ধারার সমন্বয়ের চেষ্টায় ছিলেন, যাঁরা ছিলেন চিন্তানায়ক—তাঁরা বুঝলেন; সমালোচনায়, শ্লেষে ধূম হয়ে উঠলেন, জেহাদ চলতে লাগলো,—পশ্চিমি ভাবধারার বিরুদ্ধে নয়—পশ্চিমিয়ানার বিরুদ্ধে—সে তা ফরাসীয়ানাই হোক আর ইংরেজিয়ানাই হোক। আমাদের দেশে সমাচার দর্পনের পুরাণো ফাইল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের য়ুরোপ যাত্রীর চিঠি (?), দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে তার প্রমাণ রয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যে মারমুখো স্বাজাত্যবোধও দেখা দিয়েছিল, অনেক খদ্যোৎ-প্রতিভার(?) আবির্ভাব হয়েছিল পশ্চিমি ভাবধারাকে রোধ

করবার জন্যে। সেদিনের বিলিতি হাওয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের পরিচয় আজও পথে ঘাটে কলেজের রেলিঙে, পুরাণো কেতাবের দোকানে মেলে। কিন্তু কার সাধ্য রোধে তার গতি! বালির বাঁধ টেকে নি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে চুরমার হয়ে গেছে, বিরোধে সংঘাতে আজ তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কালাপানি পার হলে আজ আর গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না, আর তাকে বিদ্রোহী বলেও ধরা হয় না। টিকি ও টাকে যাঁরা হিন্দুয়ানির জয়ধ্বজা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তারাও আজ নীরব থাকেন, মেনে নেন। না মেনে উপায়ও নেই। খাওয়া-ছোঁওয়ার গড় কেটে দেশকে আলাদা করে রাখা যায় না। বিজ্ঞান গড় ভেঙে দিয়ে পৃথিবীকে টেনে এনেছে কাছে—তাকে এক করে দিয়েছে—মানুষকেও তাই। যে-কোনো দেশের মানুষ আজ পৃথিবীর মানুষ। তার সদ্ভাব বিকাশ আরো দিন দিন হচ্ছে, হবে, কিন্তু এখনো সংস্কারের জড়টুকু মরেনি। দেশের মর্মমূলে তার শেষ শিকড়টুকু এখনো আছে, রস টানছে ধুঁকে ধুকে। কালার ঘরে শ্বেতাঙ্গিনী আজকাল স্থান পায়, তেমন সমালোচনা ওঠে না, একঘরে হয় না, তবু নাকি নাক একটু কুঁচকে যায়—মৃদুস্বরে ছি-ছিঃ ওঠে। শ্বেতাঙ্গিনীরাও কালার যোগ্য ঘরণী সবাই হতে পারেন না। তাঁদের সংস্কারে বাধা দেয়। এ বিরোধ সরে এসেছে, তবু এখনো আছে, ভবিষ্যতে থাকবে না।

চীন ভারতবর্ষ নয়, তবে এশিয়া তো বটে। ঔপনিবেশিক শাসন সেখানেও কায়েম ছিল। ভাবধারার সংঘাত সেখানেও অনিবার্য। আর অনিবার্য সংস্কারের বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নখর গজিয়ে আমেরিকা তাকে তখন চেপে ধরেছে, ছিন্নভিন্ন করছে। ইয়াঙ্কি হয়ে উঠছে মানুষ পোশাকে, আচারে ব্যবহারে। ইয়াঙ্কি দেশটা মাটির না সোনার তা নিয়ে ভাবতে বসেছে। এরই মধ্যে পড়েছে প্রাগগ্রসরতার স্ফুলিঙ্গ। মানুষের অধিকারের দাবী প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে

এসে পৌঁছেছে চীনে। হয়েছে সান ইয়াৎসেনের আবির্ভাব। পিগ্‌টেল গেছে, মেয়েদের পা ছোট করার রেওয়াজ সরকারীভাবে গেছে, কিন্তু যায় নি বেসরকারীভাবে। এমনি দিনের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠছে শ্রীমতী পার্ল বাকের 'দুইধারায়' (East wind : West wind)।

শ্রীমতী বাক্ এশিয়ার সত্তাব সঙ্গে য়ুরোপের সত্তার মিল খুঁজেছেন, বিরোধের মর্মমূলে পৌঁছেছেন। তার কারণ, তিনি এ বিরোধ ইয়াঙ্কি সৌখীন ভ্রমণকারীদের চোখে দেখেন নি, তিনি তা দেখেছেন তাদের একজন হয়ে, তাদেরই সঙ্গে মিশে। তাঁর চীনা প্রীতি, চীনা সহানুভূতিতে খাদ নেই; নেই সাদা-গবের রং—যদিও কোনো সমালোচক চীনা পরিবেশে সাদা মানুষের আমদানীতে সে-ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু শ্রীমতী বাক্ এ বিষয়ে সিজারের পত্নীর মতোই সন্দেহের অতীত। তিনি চীনের কথা চীনের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে লিখেছেন—সাদার মহিমা প্রচার করতে যান নি। 'দুইধারায়' দেখি তারই মূর্ত প্রকাশ। চীনা মেয়ে কিউ ই-লান, তারই জবানি এ কাহিনী। এ যেন তারই কথা, শ্রীমতী বাক্ শুধু সংবাদ-দাত্রী—লিপিকার।

মেয়েটি বনেদী ঘরের। ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটেছে তখন, তাই কুসংস্কারই তখন সংস্কার—ঐতিহ্য। কিন্তু এদিকে ঐতিহ্যের লুপ্ত বেণীতে বইছে প্রগতির জোয়ার। সে-বিরোধ উঁচু প্রাচীরঘেরা অন্দর মহলে এসে পৌঁছায়, তাকে অভিভূত করে দেয়। কিন্তু পথের হদিশ নেই। অবশেষে প্রাচীর-ঘেরা অন্দর থেকে মুক্তি দিলেন স্বামী—বিদেশী শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত—সাত সাগরের পারে সে-শিক্ষালাভ ঘটেছে। কিন্তু তিনি পীত ইংরেজ বা ইয়াঙ্কি নন, চীনা মানুষ, সমন্বয় সাধন করেছেন। কিউ-ই-লান শুরু পেল, বহু বিরোধ, বহু সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পথের হদিশ পেল, প্রাচ্যের জমিনে দাঁড়িয়ে, ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পাশ্চাত্যকে দুবাহু বাড়িয়ে

বরণ করে নিলে নিজের ঘরে। সে হোলো মূর্ত প্রগতি। পুরাণো দিনকে সে শ্রদ্ধা জানালো, আবার দাদার বিদেশী বৌয়ের পক্ষ সমর্থন করলে। দুইধারার সমন্বয় ঘটলো। এ সমন্বয় ঘটালে স্বামীর নির্দেশ, বিদেশী বৌয়ের ভালবাসা আর নবজাতকের আগমন।

নবজাতক যেন নতুন বার্তা নিয়ে এল। সে চীনা বাপ আর বিদেশী মার ছেলে—কিন্তু সে চীনেরই মানুষ। তাই কি? শুধু কি তাকে দেশের গণ্ডীতে ধরে রাখা যায়? বিদেশী বৌ কি দাবী জানাবে না? তাহলে? তার সমন্বয়ের সুর বেজে উঠলো বিদেশী মার মনে, কিউ-ই-লানের মনে। সে হবে দুই দেশের মানুষ—দেশের কেন, দুই মহাদেশের মানুষ—পৃথিবীর মানুষ। সমুদ্রের গণ্ডী সে বিরাটকে কি করে ঘিরে রাখবে আজকের এই আধুনিক যুগে? তার অভিধা হবে আন্তর্জাতিক। শ্রীমতী পার্ল বাক্ সেই নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন নবজাতকের সম্ভাবনায়—তার জন্মে। মারমুখো ইয়াঙ্কিয়ানার গর্বে প্রাচ্য প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য—এই ধুয়ো তুলে স্বপ্ন চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেন নি। সহানুভূতির খাদ মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। জীবনের দোয়াতটা থেকে যে কালিটুকু নিয়ে ছবি এঁকেছেন, তা আবছা নয়, পাকা হয়ে ফুটেছে কালির রং, বাহার খুলেছে। এইখানেই শ্রীমতী বাকের সৃষ্টির সার্থকতা।

বিদেশী এক খবরের কাগজ এ বইখানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'যাই হোক না, এ বইখানা পড়বার সুযোগ হারাবেন না।' একে বিজ্ঞাপনের জয়ঢাকের নির্ঘোষ বলে মানতে ইচ্ছে হয় না! একে বলা যায় স্বতোৎসারিত প্রশংসা। এ প্রশংসা শ্রীমতী বাকের সর্বতোভাবে প্রাপ্য।

অশোক গুহ

[এক]

চীনা মেয়েটি বলে :

বোন আমার, তোমার কাছে যেমন করে এ কথা বলতে পারি, এমন করে তো আর কারো কাছে পারি না—আমার নিজের দেশের মেয়ের কাছেও না। আমার স্বামী যেখানে বারো বছর কাটিয়ে এলেন সে-দূর দেশের কথা ওরা কি করে বুঝবে! আমার স্বামী তো পাকা সাহেব। বারো বছর তোমাদের দেশে কাটিয়ে ওঁর চাল-চলন একেবারে বদলে গেছে! ওদের কাছে তাঁর কথা বলতে গেলে অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকবে, হয়তো গালাগালও দিয়ে বসবে—না, সে আমি সহ্য করতে পারবো না! আবার বিদেশী মেয়েদের কাছেও তা বলা চলে না বোন। ওরা যে আমাদের দেশের মানুষকে চেনে না। সেই পুরানো সাম্রাজ্যের সময় থেকে আমাদের জীবনধারা কেমন চলছে তাও জানে না। কিন্তু তুমি? তুমি তো আর ওদের মতো নও। তুমি তো আমাদের ভিতরে গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিলে। আমার স্বামী যেখানে বিদেশী বই পড়েছেন সেই দেশের মানুষ তুমি, তুমিই তাই বুঝবে আমার কথা। তাইতো বোন, তোমার কাছে ছুটে আসি আমার সুখ-দুঃখের গল্প করতে। তুমি-ই বুঝবে আমার স্বামীকে, আমাকে, আমার জাতিকে। তা হলে বলি বোন, হাঁ, তুমিই বুঝবে আমার দুঃখ।

তুমি তো জানো আজ পাঁচশ বছর ধরে আমার পূজনীয় পূর্ব-পুরুষরা মধ্যরাজ্যের এই পুরানো শহরে আছেন। তাঁরা আধুনিকতার আলোর ছোঁয়া কেউ পাননি—আর তা চানওনি।

এই শহরের ওপরে তাই তাঁদের মায়া পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই! তা না হলে পাঁচশ বছরে একটিবার বদলাবারও নাম করেন নি! তাঁরা এইখানেই সুখ-স্বচ্ছন্দে, তাঁদের জীবন কাটিয়ে গেছেন। বাবাও পূর্ণমাত্রায় তাঁদের স্বভাব পেয়েছিলেন। তিনিও পূর্বপুরুষের রক্ষণশীলতাকে বজায় রেখে নিরুদ্বেগে নিজের জীবন কাটিয়ে গেছেন। আমারও গর্ব, এই রক্ষণশীলতার আবহাওয়ায় আমার জীবনও গড়ে উঠেছে—এই জীবনকে আমি সত্য ও সুন্দর বলে মেনে নিয়েছি। আলাদা জীবনের স্বপ্নও তো আমি দেখিনি। আমার তো মনে হয় আমি আর আমার পূর্বপুরুষরাই সত্যিকার মানুষ। আর কে বা আছে! যখন শুনি, আধুনিক মেয়েরা রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে, লজ্জায় শিউরে উঠি। ছিঃ, একি বেহায়াপণা! আমার মতো নয়, পুরুষের মতো যথা-সর্থা ঘুরে বেড়ায়! ওদের তো আমি মেয়েই বলি না। আমাদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে আধুনিকতার এই বিষাক্ত হাওয়া কোন দিনই ঢুকতে পারে নি। বাবা ও মা তাঁদের যুগার্জিত সংস্কারের বলে তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমিও তাঁদের মেয়ে তো, আধুনিক হাওয়া তাই আমাকে ছুঁতেও পারে নি। আর আমি তা চাইওনি, মোটেও চাই নি। এখন কিন্তু বোন, অনেক বদলে গেছি, নতুন হাওয়াকে আগের চোখে আর বিচার করতে সাহস হয় না। আজকাল আবার এই অদ্ভুত ধরণের জীবদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ওরা আধুনিকা। ভাবি—আমি কবে ওদের মতো হতে পারব? না গো, না বোন, আমার জন্যে নয়, আমার স্বামীর জন্যে। আমার স্বামী যে আবার ঐ দলেরই একজন।

আমি সুন্দর নই। অন্তত উনি তো কোনোদিন মনে করেন নি! আর ওঁর কি সুন্দর অসুন্দর বিচার করবার মত চোখ আছে! চার-

সাগর-পারের আধুনিকতার ছানি ওঁর চোখে! নতুন জিনিষ, নতুন ধরণ-ধারণই ওঁর কাছে সুন্দর।

বোন, মা আমার খুব বুদ্ধিমতী। যখন আমার বয়স দশ বছর, সবে শিশু থেকে যখন কুমারী জীবনে পা বাড়িয়েছি, মা আমাকে একদিন ডেকে বললেন:

'মা, শোন, তুমি বড়ো হয়েছ, জীবনের পথে চলার সময় এগিয়ে এলো। সবদা এই কথাটি মনে রেখো: মেয়েরা পুরুষের কাছে ফুলের মত নম্র আর নীরব হয়ে থাকবে, বুক ফাটবে তো, মুখ ফুটবে না,—এ কথাটি কোনদিন ভুলো না।'

প্রথম যখন স্বামীর কাছে গেলাম, মার উপদেশ কানে বাজতে লাগলো। মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, হাত দুটি সামনে, উনি কথা বললেন, উত্তর দিলাম না। কি জানি, বোবাই ঠাওরালেন নাকি! নয়তো বোকা-হাবা!

এমন-কিছু আমার নেই যা দিয়ে ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি। যখনি ওঁর মন পাব এমন কিছু ভাবতে যাই মনটা যেন নিরানো মাঠের মতো ফাঁকা হয়ে যায়। ছুঁচের কাজ করতে-করতে তো অনেক মিষ্টি কথা মনে পড়ে। নির্জনে ঘরে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কতদিন তো কত কথা ভাবি। ওঁকে বলব ওঁকে আমি ভালবাসি। না, বোন, পশ্চিমী মেয়েদের অমন নীরস কাঠ-খোট্টার মত কথা নয়! বলব কথা, মানে থাকবে কথার আড়ালে লুকানো: বলব:

'স্বামী. ভোরের সৌন্দর্য আজ দেখেছিলেন? কি করে শুরু হলো উষা! নির্জীব, ঘুমন্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ আলোর কামনায় জেগে উঠলো। আঁধার, ঘন আঁধারের বুকে এলো প্রথম আলোর স্পর্শ। স্বামী, দেবতা, আমি সেই নির্জীব আঁধার-ভরা পৃথিবী, তোমার স্পর্শের কামনায় ব্যাকুল।'

সূর্য যখন ডোবে পদ্ম-হ্রদের জলে দিনশেষের পাণ্ডুরতা ছেয়ে যায়। কতদিন কাঁদতে-কাঁদতে ভেবেছি বেদনা-পাণ্ডুর পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলব :

'সূর্য ডুবলো। ঐ শীর্ণ জল রেখা—ওর জীবন কি ব্যথায়ই না ভরে গেল। ও জানে না জ্যোৎস্না ওকে আনন্দ দেবে কি না, জানে না চাঁদের কোমল স্পর্শের ইতিহাস। ও মরবে সূর্যের বিরহে। স্বামী, তুমি এস, ফিরে এস, নিরাপদে এস আমার কাছে। আমি তোমার বিরহে যে অমনি শীর্ণ হয়ে যাব, ম্লান হয়ে যাব।'

কিন্তু যখন উনি বাড়ি ফেরেন, ও কথা তাঁকে বলতে পারি কই? খাঁটি সাহেব সেজেই তো ফেরেন। দূর্, ও সব কথা সাহেবকে বলা যায় নাকি! তাহলে শেষটায় বিদেশীকেই বিয়ে করলাম। আমার এত ঘটা করে পীচ-রঙা সাটীনের পোষাক পরা, সদ্য বাঁধা চুলে মুক্তা গোঁজা সবই তো বিফল। তিনি ফিরেও তাকান না। কথাও তো কম বলেন, আবার কেমন উদাসীন ভাব! বিদেশী—আমার স্বামী বিদেশী! আমাকে হয়তো বা কুশ্রী বলেই মনে করেন।

বোন, এই তো আমার দুঃখ। মোটে একমাস হোলো বিয়ে হয়েছে, স্বামীর চোখে এরই মধ্যে আমি কুশ্রী বনে গেছি।

বোন,

তিন দিন বসে বসে তো ভেবেছি, কি করে স্বামীকে আমার সুখী করবো, তাঁর মনের মত হব। কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারি নি। মনে ধিক্কার এসেছে। আমি কি তাদেরই বংশের মেয়ে নই যারা স্বামীর সোহাগ পেয়েছিলেন? কিন্তু হায়, তারা আমার মত বিশ্রী দেখতে তো ছিলেন না! তক্ষুনি মনে পড়ে কিউই-মীর কথা। সুঙ আমলে

আমার বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। হাঁ, তিনি তো বিশ্রী দেখতেই ছিলেন—তিন বছর বয়সে বসন্ত হয়ে সমস্ত মুখ দাগে ভরে গিয়েছিল! তবু তার ছিল গো, রূপ ছিল! পুঁথির পাতায় তাই তো লেখা আছে। কালো মানিকের মতো ছিল দুটি চোখ আর কি তার স্বর' বসন্তে যেমন হাওয়া এসে বেনুবন দুলিয়ে দিয়ে যায়, তেমনি গো তেমনি। কি স্বামী-সোহাগিনীই ছিলেন তিনি! ছ-ছটি উপপত্নী থাকলেও স্বামী তাকেই ভালবাসতেন। অতদূরই বা যেতে হবে কেন? ক'পুরুষ আগের আমারই বংশেরমেয়ে ইয়াং-কিউই-কী—তিনি তার হাতের উপর বসিয়ে রাখতেন একটি দুধের মত সাদা পাখী। তিনি সমস্ত চীন সাম্রাজ্যখানা হাতেব মুঠোয় পুরে রেখেছিলেন। এমন যে চীন সম্রাট, ভগবানের যিনি সন্তান, তিনিও তাঁর রূপে আত্মহারা হয়ে ছিলেন। জানি তো বোন, এদের পায়ের নখেরও যোগ্যা আমি নই, তবু তো আমি এঁদের বংশেরই মেয়ে, এদের রক্ত আমারই রক্ত এদের অস্থি আমারই অস্থি!

আমার ব্রোঞ্জ-ফ্রেমে বাঁধান আরশিতে মুখখানা ভাল করে দেখেছি, না, না, নিজের জন্য নয়, ওঁর জন্যই দেখতে হয়েছে। কেন, এমন কি খারাপ দেখতে আমি? কত মেয়ে তো আছে আমার চাইতে কুশ্রী! আমার চোখ দু'টি তো বেশ—সাদার ভিতর কালো মনি দু'টি জ্বলছে; কান দুটিও বেশ ছোটো, দুল পরলে মানায় যা চমৎকার! ডিমের মত মুখের সঙ্গে ঠোঁট দু'টি তো দিব্যি পাতলা, নরম আর লাল! কিন্তু কেমন যেন ম্লান—সতেজ ভাব নেই একটুও। আর ভ্রূ দু'টি, আর একটু টেনে দিলেই বা কার কি ক্ষতি হত? যাক্, খোদার উপর খোদ্‌কারি করতে তো আর কসুর নেই। একটু গোলাপী রঙ হাতে ঘসে গালে দিয়ে খুঁতটুকু শুধরে নিই। আর কালো রঙে তুলি ডুবিয়ে টেনে দিই ভ্রূ।

আমি তখন তো বেশ সুন্দর। একেবারে আমার স্বামীর জন্যে

তৈরি, কিন্তু যখন তিনি আমার দিকে তাকান—ঠোঁট, ভ্রূ কিছুই দেখেন না। হাঁ, তা বুঝতে পারি বই কি। তাঁর মন রয়েছে চার সাগরের পারে, হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীতে—কিন্তু আমার দিকে নয়, আমার দিকে নয়। অথচ আমি তো তাঁর প্রতীক্ষায়ই বসে আছি।

দৈবজ্ঞ যেদিন এসে বিয়ের দিন ঠিক করলেন, সে দিনের কথা আজও মনে পড়ে।

চারদিকে ধুমধাম। বড় বড় লাল বার্নিশ-করা বাক্স এলো বিয়ের বাজার ভর্তি হয়ে, লাল ফুলদার সাটিনের লেপ-তোষকের স্তূপ হয়ে গেল টেবিলের উপরে; আর বিয়ের পিঠেয় একটা গোল প্যাগোডা তৈরি হলো। বাড়িতে কি আনন্দ।

এমনি একদিনে মা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে, চুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম, তিনি তখন তাঁর প্রিয় আবলুস কাঠের চেয়ারটিতে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। রূপো-বাঁধানো বাঁশের তামাক খাবার নলটি দেয়ালের এক কোনে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। আমি মাথা নুয়ে, তাঁর চোখের দিকে না চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ স্পর্শ যেন আমার মুখে, চোখে, সারাদেহে এসে লাগছে, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করছে। তিনি আমাকে বসতে বলে পাশের রেকাব থেকে কতগুলো তরমুজের বীচি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন; তেমনি শান্ত মুখে চিরাভ্যস্ত বিষন্নতা। মা আমার বুদ্ধিমতী। কিছুক্ষণ পরে বললেন:

'মা, কিউই-লান, যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তোমার জন্মের আগে থেকেই তুমি তাঁর কাছে বাগদত্তা। তাঁর বাবা আর তোমার

বাবা পরম বন্ধু। এই বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁরা তোমাদের এই বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তোমার স্বামীর যখন ছ'বছর বয়স, তখন তুমি জন্মালে, ভগবানের ইঙ্গিতে তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষারও উপায় হলো। আর সেইভাবেই পালিত হয়েছ তুমি।

'এই সতেরো বছর ধরে এই দিনটির কথাই শুধু আমি ভেবেছি, তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছি, মনে রয়েছে তোমার স্বামীর কথা, তোমার শাশুড়ির কথা। সব দিক দিয়ে তাঁদের উপযুক্ত ক'রে যেন তোমাকে গড়ে তুলতে পারি—এই ছিল আমার একমাত্র চেষ্টা। গুরুজনের সুমুখে কেমন করে দাঁড়াতে হয়, তাঁদের নিন্দা বা প্রশংসা কেমন চুপ করে শুনে যেতে হয়, কেমন করে তাঁদের চা দিতে হয়—সবই আমি তোমাকে শিখিয়েছি। রোদ হোক আর বৃষ্টি হোক, ফুল যেমন নিজেকে সঁপে দেয় তেমনি করে তো মেয়েরা নিজেদের সঁপে দেবে।'

'হাঁ তারপর, স্বামীর কথা।' স্বামীর ভালবাসা পেতে হলে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, তিনি যখন কাছে ডাকবেন, দিব্যি সেজে গুজে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। কথা বলো না, যা জানাবার চোখ-মুখের হাবভাবে জানিও।—এ কথাগুলো যে কত দামী মা, স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তা বুঝতে পারবে। যখন সে-সময় আসবে তখন তো থাকবে তার সঙ্গে একা। তাইত জানা দরকার মা এসব কথা। আর তা আমি তোমাকে শিখিয়েও দিয়েছি। স্বামীর খিদের সময় তাঁকে নানা মিষ্টিখাবার আর পাঁচ রকম রেঁধে দেবে। তিনি তাতেই তোমার মূল্য বুঝতে পারবেন। রান্নার কৌশল দেখিয়ে তাঁকে ভোলাতে কখনো কসুর কোরো না। একজন ভদ্রমহিলার কর্তব্য কি, বোধ হয়, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গুরুজনদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা, চাকর চাকরাণীদের সঙ্গে কথা বলা, গাড়ি চড়া—এই সবের ভেতর দিয়েই তো বড় বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহকর্ত্রীর

রীতিনীতি, হাসবার কৌশল, ফুল আর মণি-মুক্তো দিয়ে খোঁপা বাঁধার কারিকুরি, ঠোঁট আর নখে রঙ দেওয়া, সুগন্ধি ছেটানো—সবই তো জান মা! বেশি আর কি বলবো, পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখবে এই আমার আশীর্ব্বাদ। সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে আশা করি তুমি তাঁদের ক্ষুণ্ণ করবে না। আহা, তোমার ঐ ছোট্ট পা দু-খানি! কত চোখের জলই না ফেলেছ, কিন্তু কি চমৎকারই না হয়েছে! কই অমন পা তো আজকালকার মেয়েদের কারো দেখলাম না। আমার পা'ও তোমার মত বয়সে এর চেয়ে সামান্যই ছোট ছিল। তোমার দাদা তো লী-দের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে। কি জানি, আমার কথামত তারা পা বাঁধতে সুরু করলো কিনা! বিশ্রী পা নিয়ে তো আর আমার ঘরের বৌ হওয়া চলবে না! আবার শুনেছি, সে নাকি মস্ত বিদ্যাবতী; কই, বিদ্যা আর রূপ তো এক জায়গায় দেখলাম না। না, আবার ঘটক পাঠাতে হবে দেখছি!

'আমার ছেলের বৌটি যদি তোমার মতই হয় মা, তাহলে খুব খুঁতখুঁত করবার কিছু থাকবে না। তোমাকে তো আমি ঘর-গৃহস্থালি থেকে সুরু করে লেখাপড়া, ছুঁচের কাজ, বাজনা—সবই শিখিয়েছি। আমাদের সেই পুরানো বীণাটি, যেটি বাজিয়ে যুগের পর যুগ ধরে আমাদের বংশের মেয়েরা স্বামীদের আনন্দ দিতেন—সেটিও তো তুমি বাজাতে শিখেছ। তোমার আঙ্গুলে জাদু আছে, নখগুলিও বেশ লম্বা রেখেছ। তোমার স্বামীর আনন্দের জন্য তুমি পুরানো কবিদের লেখা গান গাইবে সেই বীণা বাজিয়ে, তোমার সুন্দর আঙুল যখন বীণার তারের ওপর খেলা করবে, স্বামী নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন। না, খুঁত তোমার শাশুড়ি ধরতে পারবেন না আমার শিক্ষায়। তবে যদি নিজের ভাগ্য মন্দ হয়, যদি সন্তান না হয় প্রথম বছরে! না হলে আমি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেব।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। আমাদের পরিবারে জ্ঞান হয়েই সবাই পেকে ওঠে। কবে যে জন্ম আর মাতৃত্বের কথা প্রথম জেনেছি তা তো মনে পড়ে না। আমাদের বাড়ীতে পুত্র-সন্তানের কামনাই তো সকলে করে। বাবার উপপত্নীরা বছরে একটি করে সন্তান প্রসব করে জন্ম-রহস্যকে অতি সাধারণ করে ফেলেছে। কিন্তু একথা—যাঃ, মা যেন কী! আমার গালের লাল ছোপটুকুও দেখতে পেলেন না! তিনি তখন কি যেন ভাবছেন আর তরমুজের বীচি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

'একটা কথা', তিনি শেষের দিকে বললেন : 'তোমার স্বামী ডাক্তারী পড়তে না বিদেশে গিয়েছিল? কে জানে, কেমন হয়! সময় এলে বোঝা যাবে। যাক্ তুমি এবার যাও।'

[দুই]

জানি না, এত কথা মার মুখে আর কেউ কখনো শুনেছে কিনা! তিনি বড়ো কম কথা বলেন; দু-একটা হুকুমের হাঁকডাক আর ভুলচুক শুধ্‌রে দেওয়া ছাড়া এত কথা বোধহয় জীবনে এই প্রথম বললেন। তা গৃহকর্ত্রীকে একটু সংযত হতে হবে বৈকি! আর অন্দর মহলে মার মতো মর্যাদা আর ক্ষমতাই বা কার আছে! তিনিই তো ঘরের গৃহিণী, তাঁকে ছ্যাবলা হলে কি আর চলে।—আচ্ছা বোন, মাকে দেখেছ তো? দেখেছ তো কি রোগা মানুষটি, মুখখানা যেন হাতির দাঁত কোঁদা, রঙও তেমনি ম্লান-সুন্দর। শুনেছি, যৌবনে ডাক-সাঁইটে সুন্দরী বলেই পরিচিত ছিলেন। বিয়ের আগে নাকি লোকে বলত, অমুকের মেয়ের ভ্রূ তো নয় যেন প্রজাপতি, আর ঠোঁট নয় যেন কুইন্স ফুলের প্রবাল রাঙা কুঁড়ি। এখন বয়স হয়ে মুখের মাংস ঝরে গেলেও তাঁর মুখ শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের পুরানো যুগের মেয়েদের ছবিগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের চার নম্বর উপপত্নী কথা বলেন বেশ গুছিয়ে। তিনি ওঁর চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন আমাদের বড়র চোখে যেন দু'টি কালো মুক্তা—পৃথিবীর দুঃখের ছোঁয়াচে কেমন যেন বিবর্ণ, ম্লান!

দুঃখিনী মা!

মার মত এমন শান্ত, সংযত এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্না কাউকে দেখলাম না বোন! ছোটবেলায় দেখেছি, মার দাপটে বাবার উপপত্নী ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ভয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারতো না। চাকর-চাকরাণীরা মার আড়ালে গজ-গজ করতো বটে, আবার প্রশংসাও করত। তাই বলে বাবার উপপত্নীদের মত সামান্য ব্যাপারে গালি-গালাজ বা চিৎকার করতে আমি তাঁকে দেখি নি। তাঁর সঙ্গে মতে

না মিললে তিনি গম্ভীরভাবে দু-একটা কথা বলতেন বা ওই কটা কথায় এমন ঘৃণা মেশানো থাকত যে অপরাধীর মনে হোত তার গায়ে তীক্ষ্ণ তুষারধারা এসে বিঁধছে !

মাঝে মাঝে তিনি আমাকে আর দাদাকে আদর করতেন, কিন্তু সে আদর এমন-কিছু নয়—একটু মাথায় হাত দেয়া, দু'টো মিষ্টি কথা বলা শুধু। কি জানি, গৃহকর্ত্রীকে বোধ হয় ওর বেশি করতে নেই ! ছ'টি সন্তানের ভেতর আমরা দু'টিই দেবতাদের দয়ায় বেঁচে আছি বলেই এই আদরটুকু পেতাম। দাদা ছেলে বলে তার ভাগ্যে আদর বেশি জুটতো। বাঃ, জুটবে না, ছেলে যে ! স্বামী আর স্বামীর বংশের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য তো মা দাদাকে উপহার দিয়েই পালন করলেন। বাবারও তো তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবার আর কিছুই ছিল না। দাদার ছেলেবেলায় যা সুন্দর চেহারা ছিল।—মা বোধ হয় এর জন্যে একটু গর্বও অনুভব করতেন।

দাদাকে দেখেছ বোন ? মার মতই পাতলা গড়ন, নরম-সরম, তেমনি লম্বা—যেন একটি সরল বাঁশ গাছ আর কি ! ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে কত খেলেছি। ও-ই তো আমাকে অক্ষর পরিচয় করালো। ওরই সাহায্যে আমার প্রথম ভাগের অক্ষরের ওপর দাগা বুলোতে শিখলাম। কিন্তু ও যে ছেলে, আমি যে মেয়ে ! ন'বছর বয়সে অন্দর ছেড়ে সেই যে সদরে চলে গেল, তারপর দেখা হত কালে-ভদ্রে ! দেখা হলেও আগের সে-ভাব আর ছিল না। আমি মেয়ে বলেই ও আর মিশতে চাইতো না। মাও কখনও ওকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন না।

সদর ছিল আমার গণ্ডীর বাইরে। বেশ মনে পড়ে, দাদা তখন আর অন্দরে আসে না। একদিন সন্ধ্যার আঁধারে পা টিপে টিপে সদরের সেই চাঁদের মত গোল দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি ভয়ই করছিল! শুধু চাকররা ধোঁয়া-ওঠা খাবারের পাত্র-নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল। যখন তারা হলঘরের দরজা খুলে ফেললে, ভেসে এল এই হাসির শব্দ আর মেয়েলি গলার গান, সরু মিঠে গলায় কে যেন ধরেছে তান। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। এবার শুধু নিস্তব্ধ বাগান।

দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম হাসির শব্দ। কি জানি যদি দাদার গলাও শোনা যায়। দাদাটা যেন কি, আমাকে একেবারে ভুলে গেছে! কান্না পাচ্ছিলো। এমন সময় কার হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলাম! ওমা দেখি, আমাদের বুড়ি ঝি ওয়াঙ্-দা-মা দাঁড়িয়ে আছে! সে চেঁচিয়ে উঠলো :

'ফের যদি এখানে দেখি, মাকে বলে দেব! এমন মেয়েও তো সাত জন্মে দেখি নি বাছা, সদরে এসে পুরুষের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে!'

লজ্জায়, ভয়ে মরে গেলাম। ফিসফিসিয়ে অজুহাত দেখালাম : 'দাদাকে খুঁজতে এসেছি। দাদা আর খেলতে আসে না।'

'না।' বুড়ি ধমকালো : 'সে আর তোমার সঙ্গে খেলবে না। সে বড় হয়েছে।'

তারপর দাদাকে আর বেশি দেখি নি। শুনেছিলাম, পড়তে নাকি সে খুব ভালবাসে। গ্রন্থ চতুষ্টয় আর পঞ্চশাস্ত্র সে পড়ে ফেলেছে, তাই বাবাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে পিকিঙে পড়তে গেছে! আমার বিয়ের সময় সে পিকিঙের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। প্রতি চিঠিতে লিখতো, সে আরো বেশি পড়তে চায় আমেরিকায় গিয়ে।

মা বিদেশ যাওয়ার নাম শুনে চটে উঠতেন; বাবারও তাতে মত ছিল না। তবে গোলমাল তিনি ভালোবাসেন না বলেই আমার মনে হত দাদাই জিতবে।

আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে, ছুটিতে দাদা দুবার বাড়ি এল। দাদা বাড়ি এসেই সবাইকে ডেকে 'বিজ্ঞান' বলে কি-একখানা বইয়ের কথা শোনালো, মাও বাদ গেলেন না। বাবা শুনে কোনো কথা বললেন না। মা তো রীতিমত চটেই গেলেন। চীনা গৃহস্থের জীবনে পশ্চিমী বিদ্যের যে কোনো দাম নেই বরং অলক্ষুণে, একথা তিনি বার বার বললেন। আর শেষবার দাদা আর একটা কাণ্ড করে বসলো! একেবারে টিপটপ সাহেব সেজে বাড়ি এসে ঢুকলো! মা তো চটে আগুন! মার ঘরে বিদেশী সেজে গম্ভীর চালে ঢুকতেই মেঝেয় লাঠি ঠুকে তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন: 'তোমার এতদূর হয়েছে! বাঁদর সেজে আমার সুমুখে আসতে লজ্জা করলো না!'

বেচারা দাদা! বাধ্য হয়ে তক্ষুনি বিদেশী পোষাক ছেড়ে ফেলতে হলো। দু-দিন খায়না-দায়না, কারো সঙ্গে কথা কয় না। শেষে বাবা পোষাক পড়তে অনুমতি দিলেন। মার কথাই কিন্তু ঠিক। চীনে পোষাকে দাদাকে কেমন সম্ভ্রান্ত লাগতো, আর মান্দারিনের মতো দেখাতো। আর বিদেশী পোষাকে পা বার ক'রে ঘোরা আমাদের পরিবারে কেউ দেখেওনি, শোনেওনি।

এই দু-বারেই আমার সঙ্গে দাদা খুব কমই কথা বললে। কি নিয়েই বা বলবে বল? আমি তো লেখা-পড়া জানা পণ্ডিত নই! বিয়ের খুঁটিনাটি শিখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে, বই পড়বো কখন?

দাদার বিয়ের কথা কি আর জিজ্ঞেস করা যেত না? যেত, কিন্তু সেখানে বাধা দিত চীনদেশের রীতি, আমার বংশগত সংস্কার। অমন কথা সোমত্ত বয়সের পুরুষ আর মেয়েতে চলে না। চাকর-চাকরাণীরা

কানাঘুষো করতো,—তা থেকে একদিন শুনলাম, এ বিয়ে নাকি ওর পছন্দ নয়। ও নাকি রীতিমতো বিরুদ্ধে! মা তিন-তিনবার বিয়ের তারিখ ঠিক করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন,—কিন্তু ও নাকি তিনবারই বাবার মত করিয়েছে, পড়া শেষ না হলে বিয়ে করবে না। লী-দের মেজ মেয়ের সঙ্গে ওর বাগদান হয়ে গেছে। লী-রা খুব বড় বংশ। যেমন মানে তেমনি ধনে। তিন পুরুষ আগে ওদের আর আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পাশাপাশি দুই প্রদেশে শাসন করতেন। সেই থেকেই দুবংশে বন্ধুত্ব।

না, দাদা নিজে পছন্দ ক'রে বাগ্দান করে নি! ওটা আমাদের রীতিও নয় বোন। আমরাও মেয়েটিকে দেখিনি। দাদা যখন এক বছরের তখন বাবা বিয়ে ঠিক করেন। তাই বিয়ের আগে দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া আসাও বন্ধ আছে। এমন কি বাগদত্তার সম্বন্ধেও কখনো কিছু শুনিনি। ওয়াঙ-দা-মা শুধু একবার চাকর-চাকরাণীদের সঙ্গে গল্প করছিল শুনেছি। সে বলছিল: 'লীদের মেয়েটার বয়সও তো ছোট কত্তার চেয়ে তিন বছর বেশি। সোয়ামি তো বয়সেও বড় হবে। কিন্তু বাপু বড় ঘর, টাকাকড়িও আছে তাই না বড় কত্তা'—আমাকে দেখে সে থেমে আবার কাজ করতে লাগলো। জানি না, দাদা কেন যে বিয়ে করতে রাজি হলো না। দাদার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে পরিবারে খুব অশান্তির সৃষ্টি হলো। বাবার প্রথমা উপপত্নী তো একদিন বেশ রসালো করেই বললেন: 'বিয়ে করতে রাজি হবে কেন? পিকিঙে কোন মাকুনির পাল্লায় পড়েছে দেখগে!'

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। দাদা বই ছাড়া কিছুই ভালবাসে না।

আমার জীবন, বোন, নিঃসঙ্গভাবে এমনিধারা অন্দরের গণ্ডীর ভেতর কাটতে লাগলো।

উপপত্নীদের ছেলেমেয়ে ছিল একপাল, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশবারও উপায় ছিল না। মা তাদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না, নিতান্ত গলগ্রহ বলেই মনে করতেন। রোজকার খাবারের বরাদ্দ বার ক'রে দেয়ার সময় এতগুলো পেট খাওয়াতে হচ্ছে ভেবে মনে মনে চটে যেতেন। বাব্বা! উপপত্নীদের সঙ্গে মেশা! তারা রাতদিন একে অপরকে গালাগাল দিত, হিংসে করত, আর চেষ্টা করতো কি ক'রে বাবার আদর পাবে। বুদ্ধি কারও ঘটে এক ফোঁটা ছিল না। বাবা তাদের ঘরে এনেছিলেন সৌন্দর্যে-মুগ্ধ হয়ে, বসন্তে-তোলা ফুলের মতো তাদের ক্ষণিকের সৌন্দর্য ফুরিয়ে গেলে তিনি তাদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তারা কিন্তু বুঝতে পারতো না যে তাদের সৌন্দর্য উবে গেছে, তাই বাবার বাড়ি আসার অনেক আগে থেকেই তারা তাদের গয়না-গাঁটি আর পোষাকের পসরা খুলে বসত। কি বোকা। জানতো না, মধুকর তাদের মধু কবে শুষে নিয়েছে! তবু বাবা তাদের ওপর অবিচার করেন নি। জুয়ায় জিতে এলে, দু-একটা টাকা তাদের দিতেন। তাতেই মহা আনন্দ! কয়েকটা দিন খুব মদ আর মেঠাই খাওয়া চলতো বোকার মতো, তারপর যে কে সেই। বাবার ফিরে আসার আগে অবধি চাকরদের কাছে আবার ধার ক'রে কিনতো নতুন জুতো আর নাকে পরবার রকমারি গয়না। বাবার আদর হারিয়ে চাকরদের শ্রদ্ধাও তারা হারিয়েছিল।

প্রথমা উপপত্নীটি ছিলেন দিব্যি মোটা-সোটা—একটি মাংসপিণ্ড বিশেষ! তার দেখবার মত জিনিস ছিল, ছোট্ট গোলগাল দু-খানি হাত, তারই কত গর্ব! রোজ নানারকম সুগন্ধি তেল মেখে হাত ধুতেন, তেলোয় মাখতেন গোলাপী আর নখে সিন্দুরে রং; তারপর সুগন্ধি ম্যাগনোলিয়া তো আছেই!

মা প্রথমার এই উগ্র বিলাসিতা আর ফাঁকা বড়াই দেখে হাড়ে

হাড়ে জ্বলতেন। মাঝে মাঝে তাকে কাপড় কাচতে বা কিছু বুনতে দিতেন। প্রথমা ভয়ে ভয়ে কাজগুলি করতেন আর গোপনে অন্য উপপত্নীদের কাছে বলে বেড়াতেন, মা তার হিংসেয় মরে যাচ্ছেন, তাই তার সৌন্দর্য নষ্ট করবার এই চেষ্টা। হাতের কোমল চামড়া খাটতে খাটতে থেঁতলে বা পুরু হয়ে গেল কিনা এই ছিল তার দিবারাত্রের চিন্তা। আমি তো ওর হাতের স্পর্শ সহ্য করতে পারিনি। কেমন উষ্ণ নরম হাত, ধরলে মনে হয় যেন হাতের মুঠোয় গলে যাবে।

বাবা অনেকদিন আগেই প্রথমাকে ত্যাগ করেছিলেন। সদরে লোকের সুমুখে অপদস্থ হবার ভয়ে বাড়ি এলেই তাকে টাকাকড়ি দিতেন ; দু এক রাত তার ঘরেও কাটাতেন। কি জানি সবার সামনে যদি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করেন, তাঁকেও বা গাল মন্দ দেন। তার গর্ভে বাবার দু'টি ছেলে হয়েছিল, সেও বোধহয় তাঁর আকর্ষণের আর এক কারণ।

ছেলেগুলোও তাদের মার মত মোটা-সোটা। সারাদিন খাই-খাই ক'রে ঘুরে বেড়াতো। সবার সঙ্গে টেবিলে বসে তো খেতই, আবার চাকরদের আস্তানায় গিয়ে যা কিছু পড়ে থাকত তাই নিয়ে চাকরদের সঙ্গে নিত্যি তিরিশ দিন ঝগড়া বাধাতো। মা-ও এই লোভী দু'টোকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি নিজে খেতেন সামান্য ক'টি ভাত, এক টুক্‌রো নোনা মাছ, এক টুকরো মুরগীর মাংস, এক পেয়ালা চা—পেটুকরা তাঁর দু-চোখের বিষ হবে না ?

প্রথমা সম্বন্ধে যদি কিছু মনে পড়ে, সে তার মরণের ভয় ! অতি পেটুক। গো-গ্রাসে মেঠাই আর তেলে চপচপে পিঠে গিলে গিলে যখন তার অসুখ হত, তখন পুরুত ডেকে গোঙাতেন আর বলতেন এবার যদি সেরে ওঠেন, ভগবান বুদ্ধকে মুক্তোর মালা দেবেন। কিন্তু

সেরে উঠলে আর মনে থাকতো না। থাবারের নীচে মানত চাপা পড়তো বোধ হয়।

দ্বিতীয়া ছিলেন একেবারে নিরীহ। কম কথা কইতেন। সংসার সম্বন্ধেও তার কৌতূহল ছিল না। তার পাঁচটি সন্তান, তার ভেতরে চারিটিই ছিল মেয়ে। তাদের তিনি দেখতেনও না। তাই এই নির্লিপ্ততা বোধ হয়। উঠোনের যে কোণটিতে খুব রোদ, সেখানে বসে তিন বছরের হাবা ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করতেন। ছেলেটা তখনো না পারতো কথা কইতে, না হাঁটতে! সে খুব কাঁদতো আর মস্ত দুটি মাই সব সময়েই চুষতো।

তৃতীয়াকে আমি সব চেয়ে পছন্দ করতাম। ছোট্ট মেয়েটি দিব্যি ফুটফুটে! শুনেছি, সু-চাউয়ে নর্তকী ছিল। নাম লা-মে। প্রথম বসন্তের পত্রহীন গাছে লা-মে ফুলের ম্লান সোনার মতো সেই সুন্দর! মুখে রঙ মাখতে সে ভালবাসতো না, শুধু শীর্ণ ভ্রূ'র ওপরে একটু কালো আর নীচের ঠোঁটে আলতোভাবে একটু লাল ছুঁইয়ে সে তার প্রসাধন সারতো। বাবার সে ছিল প্রিয় সঙ্গিনী, তাঁর গর্ব। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো বলে আমরা তাঁকে প্রথমে তেমন দেখিনি।

গত বছর—আমার বিয়ের আগে—সন্তান প্রসবের জন্য সে বাড়িতেই ছিল। তার একটি ছেলে হলো। কি চমৎকার নাদুস নুদুস আর সুন্দর ছেলেটি! বাবা বাড়ি এলে খোকাটিকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে শুইয়ে দিল। মাতৃত্বের গর্বে তখন তার মুখখানি ঝলমল করছে! বাবা এতদিন যত গয়না দিয়েছেন আর সোহাগ দেখিয়েছেন তারই প্রতিদান সে দিল। সন্তান প্রসবের পর হাসি, গান, গল্পে বাড়িখানা সে মাত ক'রে রাখতো। অমন সুশ্রী মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। পোশাকের বাহারে সে শ্রী যেন আরো শতগুণ বেড়ে যেত।

কালো মখমলের সারোঙ আর সবুজ জামা পরে, কানে মুক্তোর দুল দুলিয়ে গান আর হাসিতে সে যেন উপচে পড়তো। বাবা বুঝি তাই তাকে এত ভালবাসতেন!

বাবা যখন তাকে নিয়ে আমোদে ডুবে থাকতেন, মা তখন একা ঘরে বসে পড়তেন কণফুসিয়াসের বাণী। আর আমি? দাদাকে খুঁজতে গিয়ে সে-দিন যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম, ইচ্ছে করতো আবার ছুটে গিয়ে তার কিছুটা উপভোগ করে আসি। উঁকি মেরে দেখে আসি উৎসব-রাতের জৌলুস। কিন্তু মা তো তা দেবেন না। তাঁকে লুকিয়ে যেতে ইচ্ছে করত না। লজ্জাই হোত।

কি লজ্জা! এখন তো মার অবাধ্যতা করেছি বলে লজ্জাই হয়। একরাতে বাবার ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম। না সেদিন আর দাদার খোঁজে নয়। কি জানি, কি ছিল সেদিনকার রাতে, সেদিনকার পদ্মের গন্ধে! কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল অন্দর মহলের গণ্ডীর বাইরে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এলাম। গরম রাতের আঁধারে আবার ফটকের ভিতর দিয়ে দেখলাম। চাঁদ আকাশে ছিল না সে দিন। কেন যে এমন করলাম বলতে পারি না। হয়তো এ এক অস্পষ্ট কামনার পূর্ণতা। গ্রীষ্মের সারা দীর্ঘ দিন সে ধরে আমাকে অশান্ত করে তুলেছিল। তাই যখন উষ্ণ রাত এল অন্ধকার নিয়ে, পদ্মগন্ধে মাতাল হয়ে গেলাম আমি। অন্দর আমার কাছে মরে গেছে বলে মনে হলো। তাই ছুটে এলাম।....দরজাগুলি খোলা। দেখলাম সারি সারি আলোর মালা বাইরের উষ্ণ আঁধার আর স্তব্ধতাকে চঞ্চল করে তুলেছে। চাকররা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।...ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড টেবিল, তার চার পাশে অসংখ্য লোক, তাদের চেয়ারের পিছনে উজ্জ্বল পোশাকে এক

একটি মেয়ে—আঙুর লতার মতই তন্বী। বাবার পাশে লা-মে শুধু বসে আছে। মুখখানা হাসি হাসি! মোমের ফুলের পাপড়ির মতোই ঝলমল করছে। খুব আস্তে আস্তে কি যেন বললো। আর হাসি…হাসি, ঘরের দেয়াল চুইয়ে যেন হাসির ঝরণা ঝরতে লাগলো! কিন্তু লা-মের মুখে তেমনি মৃদু হাসি, জোরে নয়।

ধরা পড়লাম। তাও আবার মার কাছে! তিনি তো কোনোদিন উঠানেও নামেন না। আজ কিনা সদরে এলেন। বরাত! সুড় সুড় করে অন্দরে ঢুকলাম। মা বাঁশের তৈরি মুড়ে-রাখা পাখা দিয়ে হাতের উপর দমাদম মেরে বললেন, 'লক্ষ্মীছাড়ি' কি দেখতে গিয়েছিলি—বেশ্যার নাচ! লজ্জাও হয় না!'

অপমানে, লজ্জায় কেঁদে ফেললাম।

পরদিনই তিনি হুকুম দিলেন চন্দ্র-ফটক স্বচ্ছ ঝিনুকের আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর কখনো ওদিকে তাকাই নি।

মা লা-মেকে ভাল না বাসুন, কিছু বলতেন না। চাকর-চাকরাণীরা এই জন্যে কর্ত্রীর খুব প্রশংসা করত। অন্য উপপত্নীরা কিন্তু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতো। লা-মে মনে করেছিল, সন্তান প্রসবের পর আর আর বারের মত বাবা তাকে নিয়ে বেরোবেন। সন্তানের দিকে নজর দিয়ে লা-মে তার সৌন্দর্য নষ্ট করতে রাজি ছিল না। সন্তান পালনের জন্য একটি জোয়ান দেখে বাঁদী ছিল। বাঁদীর নিজের একটা মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় নি। মোটাসোটা মেয়ে লোকটি, ভারি মুখরা, কিন্তু ছেলেটা অষ্ট প্রহর তার কোলেই থাকত। তার নিজের মা কিন্তু দেখতও না। তবু উৎসবের দিনে মা নতুন পোশাক, নতুন জুতো পরিয়ে আদর করে কোলে নিত, কখনো বা চুমু খেত। কেঁদে উঠলে কিন্তু একদণ্ড রাখতো না, বাঁদীর কোলে ফেলে দিয়ে পালাতো।

ছেলে হওয়ার পর বাবার কাছ থেকে আর তেমন আদর সে পেত

না। অন্যান্য উপপত্নীদের মতই বাবার আদর পাবার জন্য নানা ছল করতো। তেমনি ঘটা করে পোশাক পরতো, তেমনি হাসতো। বাবা মুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু লা-মের যৌবন নিঃশেষিতপ্রায় একথা তিনি জানতেন। তার মসৃণ মুক্তোর মতো উজ্জ্বল মুখে তখন ভাঁজ পড়েছে। যৌবনের লাবণ্য নিঃশেষ হতে বসেছে। তাই সেবার বিদেশে যাওয়ার সময় লা-মেকে তিনি সঙ্গে নিলেন না।

লা-মে রাগে, দুঃখে, অপমানে ফুঁসে উঠলো; সবচেয়ে খুশি হলো উপপত্নীরা। মা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। বুড়ি ঝি ওয়াঙ-দা-মা কিন্তু গজ্ গজ্ করতে-করতে বললো:

'আর একটা কুঁড়েরধাড়ি বাড়লো সংসারে। কর্তার সখ মিটেছে।'

অসন্তোষ, দুঃখ আর দারুণ ক্লান্তি নিয়ে লা-মে তলিয়ে গেল অন্দর-মহলের একঘেঁয়ে জীবনযাত্রার মাঝে। সে ছিল উৎসবের আনন্দ, সবার চোখের মণি। কিন্তু সেদিন থেকে কেউ তার কথা আর ভাবতো না। সে চুপচাপ বসে থাকতো। মাঝে মাঝে রাগে দুঃখে কি সব বলতো, কিন্তু কে-ইবা শোনে তার কথা! আমার বিয়ের পরে শুনেছিলাম, সে নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

না, বোন, উপপত্নীদের জন্য জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে কেন? এ তো বংশের রীতি। সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য ওসব প্রয়োজন। আর বাবা মাকে ভাল না বাসুন, শ্রদ্ধা তো করেন। শ্রদ্ধার কারণও আছে। মা বুদ্ধিমতী। সংসার চালাতে তার জুড়ি মেলে না। সংসারের ভার মার মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাবা এখানে ওখানে আমোদ করে বেড়াতেন। মা ও ওসব নিয়ে তাঁকে ঘাটাতেন না। তিনি সংসার আর ধর্ম নিয়ে দিন কাটাতেন। এমনিভাবে সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল।

আমার বাড়ি, কত প্রিয় সে আমার কাছে! আগুনের কুণ্ডের

আলোয় যেমন দেয়ালের ছবিগুলি ঝলমল করে ওঠে, তেমনি তো আমার ছেলেবেলা স্মৃতির আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো। সেই আঙিনা—যেখানে বসে বসে দেখতাম ভোরে পদ্মের কুঁড়ি ঝিলে ফুটে উঠছে দলে দলে, ছাদের ওপরে পিওনির সমারোহ। আর ঘরগুলি—ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করছে, গৃহদেবতার সুমুখে জ্বলছে কেঁপে কেঁপে মোমের বাতি! আমার মার ঘর—তিনি বসে আছেন, তার সংকল্পে দৃঢ় সুন্দর মুখখানা নুয়ে পড়েছে বইয়ের উপর। তারই পরে বিরাট চাঁদোয়া ঢাকা খাট!

হলঘর তো সবার সেরা। বিরাট কালো কালো টিক কাঠের কৌচ আর চেয়ার, লম্বা টেবিল, দরজায় দরজায় লাল মখমলের পর্দা। টেবিলের ঠিক উপরেই প্রথম মিং সম্রাটের ছবি—এক অনমনীয় মুখ, পাহাড়ের চূড়ার মতো উদ্ধত, উন্নত তাঁর চিবুক। ছবির দুধারে ঝুলছে ছোট ছোট সোনার পাতে লেখা পুঁথি-পাটা। হলের দক্ষিণ দিকটা কাঠের শার্সি আর লাল কাগজে মোড়া। এই কাগজে মোড়া দেয়াল থেকে ঝরে পড়ছে মৃদু আলো, ছড়িয়ে পড়ছে হলের সম্ভ্রান্ত আবছা আঁধারে। ছাদের বিরাট কড়িকাঠেও গিয়ে পৌঁছচ্ছে, সোনালি আর সিঁদুরে ধারগুলো ঝলমল করে উঠছে। আমার পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত এই হল ঘরে চুপ করে বসে যখন দেখতাম গোধূলির আলো নীরবে এসে পড়ছে, আলো-আঁধার রচনা করছে, আমার কাছে সে যেন এক গানের সুর বলেই মনে হোত।

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে সম্ভ্রান্ত মহিলারা দেখা করতে আসতেন। হল তখন উৎসবে মুখর হয়ে উঠতো। সেই পুরানো দিনের হলে আসতেন সুসজ্জিতা মহিলারা, আলোয় আলো হয়ে যেত, হাসির ঢেউ বইতো, আর শিষ্টাচারের গুঞ্জন। লালরং-করা পরাতে করে ছোট ছোট পিঠে পরিবেশন করতো বাঁদিরা। মা গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালন করতেন, সৌজন্য আর গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি তখন তিনি। এই কড়িকাঠ-

গুলি এই হলে শত শত বছর ধরে এমনি উৎসব দেখে এসেছে—দেখে এসেছে কালো খোঁপার সার, কালো চোখ, রামধনু-রঙা রেশম আর মখমল; মুক্তো, চুনি পান্না ঝলসে উঠতে দেখেছে সুঠাম সুন্দর হাতীর দাঁতের মতো শুভ্র হাতে।

আমার বাড়ি—প্রিয় বাড়ি আমার।

নিজের কথাও তো মনে পড়ে। ছোট্ট মেয়েটি, মুখ গম্ভীর করে দাদার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি আঙ্গিনার এক কোণে। গৃহদেবতাদের দাহ করা হবে। তাঁদের কাগজের ঠোঁটে মধু দিয়ে দেওয়া হলো যাতে তাঁরা স্বর্গে মিষ্টি কথা নিয়েই যান। চাকর-বাকররা কখন ঝগড়া করেছে, পাত্র থেকে খাবার চুরি করেছে সে কথা যেন বলতে ভুলে যান। এই অদৃশ্যলোকের দূতদের কথা মনে হতে তো ভয়ই করতো। কথাটি কইতাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ড্রাগন উৎসবের দিনের কথাও মনে আছে। উৎসবের দিনের সেরা পোশাকটি পরতাম তখন—বেগুনি রেশমের উপরে সেই যে ফুল কাটা জামা। সময় যেন আর কাটতনা। কখন সন্ধ্যে হবে, তখন দাদা ড্রাগনমুখো-ছিপ দেখাতে নদীর পারে নিয়ে যাবে।

আমার বুড়ী দাইমা আমাকে লণ্ঠন-উৎসব থেকে এনে দিলে এক লণ্ঠন। পদ্মের মতো তো ছিল লণ্ঠনটা। রাত যখন এল তখন আমার আনন্দ দেখে দাই-মার কি হাসি! ঐ লণ্ঠনের ভিতরের মোম জ্বালিয়ে দিলাম আমি।

মনে পড়ে, মার পাশে পাশে চলেছি মন্দিরে। কুণ্ডে ধূপ দিচ্ছেন তিনি। দেবতার সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসলাম দুজনে, ভয়ে বুকখানা যেন হিম হয়ে গেল।

বোন, এই তো আমাদের পরিবারের কথা শুনলে,—এখন বলতো, মনের এতখানি সংস্কার নিয়ে পশ্চিমী আবহাওয়ায় মানুষ স্বামীর ঘর কি

করে করবো ? তাই তো মার এত শিক্ষা, এত উপদেশ বৃথাই হলো ! স্বামীর ঘরে এসে মাঝে মাঝে ভেবেছি,—প্রসাধনের চটকে, নীল কামিজের জেল্লায় স্বামীর চোখ ধাঁধিয়ে দেব। চুলে গুঁজবো যুথীর মালা, পায়ে পরবো সাটীনের জুতো। যখন তিনি আসবেন, এই বেশে এগিয়ে যাব তাঁকে বরণ করতে—দেখি, তাঁর মন জয় করতে পারি কিনা ! কি হলো বোন ? তিনি চেয়েও দেখেন না। তাঁর চোখ পড়ে আমাকে এড়িয়ে টেবিলে একরাশ বই আর চিঠির ওপর ! না, আমি তাঁর কাছে কেউ নেই ! আমি যে আছি একথাই তিনি ভুলে যান।

ভয় তো বুকে বাসা বেঁধেই আছে। মনে হয়, বিয়ের আগে একটি দিনের কথা। পুরোনো দারোয়ানকে দিয়ে মা দু'খানি চিঠি পাঠালেন সেদিন। একখানা বাবার, আর একখানা আমার হবু-শাশুড়ীর নামে। ঝি-চাকররা কাণাকাণি করতে লাগলো ! শুনলাম, আমার বাগ্‌দত্ত স্বামী না কি আমি অশিক্ষিত বলে, আমি পা ছোট করেছি বলে—এ-বিয়ে ভেঙে দিতে চান ! কাঁদলাম। দাসীরা সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'না গো না, তোমার কথা নয়, তা-ওদের মেয়ের কথা বয়ু গো।'

এখন তো সে কথা মনে হয়, আর ভাবতে গিয়ে কেমন হয়ে যাই, তবে কি আমার কথাই বলেছিল ? চাকর-বাকররা তো মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমি কি অশিক্ষিত ? গৃহস্থালি বা চেহারার দিক দিয়ে তো খারাপ নই ! আর ছোট্ট পা ? ওমা, পা ছোট্ট হবে না তো কি চাষার মেয়ের মত ধ্যাবড়া, বিশ্রী পা হবে ! না, না, আমার কথা তারা বলে নি, নিশ্চয়ই আর কারো কথা ! আমার কথা হতেই পারে না !

[তিন]

মার কাছে বিদায় নিয়ে যখন স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য লাল রঙের রিক্সায় চাপলাম, তখন কি একবারও ভেবেছি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না? হোন না পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, আমার এমন রং, এমন নাক, মুখ চোখ, এমন ছোটটি দেখতে আমি—তাঁর সোহাগ পাব না আর! নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পেয়ে নিরাশ হবেন না, ঠকবেন না!

পানোৎসবের সময় লাল সিল্কের ওড়নাটা একটু তুলে তাঁর পানে তাকালাম। বিদেশী পোশাক তাঁর পরনে—কই তেমন বিশ্রী তো লাগলো না! সোজা বাঁশ গাছটির মতো লম্বা, তেমনি সতেজ। আমার বুকে উগ্র কামনা আবার নিরাশা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তো একটুও উষ্ণতা নেই! অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখবার কোনো ইচ্ছেই তাঁর তো নেই। প্রথামত একসঙ্গে পান করলাম। পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করলাম, তাঁর বাবা-মাকে প্রণাম করলাম। আমি হলাম তাঁদের ঘরের বৌ। চিরদিনের জন্য ছাড়লাম আমার নিজের ঘর। কিন্তু স্বামী—স্বামী আমার পানে ফিরেও তাকালেন না!

বাসর ঘরের নিরালায় একাই বসেছিলাম। সমস্ত জীবন ধরে যে-মুহূর্তটির কথা ভেবেছি, সেই মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো। ভয় করছিল। আমার হাত দুখানা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল। বুকের ভিতরটাও বুঝি। স্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন। তখনো বিদেশী পোশাক তাঁর পরনে। এগিয়ে এসে মুখের ওড়নাখানা খুলে আমার পানে তাকালেন। কি

গভীর তাঁর চোখের দৃষ্টি! কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। তিনি আমার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন। সমস্ত দেহে উষ্ণতা অনুভব করলাম। আজ থেকে আমি তাঁর স্ত্রী! তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন।

মার উপদেশ মনে পড়লো :—নির্জীব হয়ে পড়বে স্বামীর স্পর্শে—মদের তলানির মত নির্জীব, মধুর উষ্ণতা নয়। তা'হলে চিরদিন তোমার প্রতি স্বামীর কামনা অটুট থাকবে।'

মার উপদেশ স্মরণ করে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়লাম। হাত বুঝি ধরতে দিতেই চাই নি। তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন। প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না। ওঁর স্বর এত শান্ত, এমন গভীর! এমন অবাক করে দিল যে আমার দেহ যেন লজ্জায় বিবশ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে গেল। এবার শুনলাম, তিনি কি বলছেন। কি বললেন জান?

"যা ভেবেছিলাম! দু'টি অজানা মানুষের মিলন কখনো সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না। বাবা-মার খেয়ালের বশে তুমি আর আমি হলাম স্বামী-স্ত্রী। .নিজেদের কোনো ইচ্ছে নেই, যেন খেলার পুতুল। যাক, শোন, আমাদের সুমুখে রয়েছে অফুরন্ত জীবন, আমরা তাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারি। আমি তো নতুন ধারার পক্ষপাতী। তুমি আমাকে সাহায্য করবে বল, বল? তুমি আমার দাসী নও, তুমি আমার স্ত্রী, আমার সমান, আমার বন্ধু।"—বাসর রাতে এই কথা শুনলাম আমার স্বামীর কাছে! প্রথমে বুঝতে পারি নি। আমি, আমি তাঁর সমান, আমি তার বন্ধু—শুনে অবাক হলাম! স্ত্রী তো দাসীই! এ তিনি কি বলছেন? এ যে সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!

তরল আগুনের মত তাঁর কথাগুলো পোড়াতে লাগলো। ইচ্ছে ছিল না তাঁর? জন্মাবার পর থেকে তো তাঁকেই স্বামী বলে জানি। তবে কি সেই যে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কথা শুনেছিলাম, তা' সত্যি!

বোন, কি কপাল বল দেখি! এত দুঃখও ছিল বরাতে।

উত্তর দেয়ার সাধ্য কি? অপ্রকাশের ব্যথায় শুধু হাত দু-খানা মোচড়ান ছাড়া উপায় রইলো না। তিনি নিজের হাতখানা আমার হাত দু'খানার ওপর রাখলেন। দুজনেই চুপচাপ। আমার শুধু মনে হচ্ছিল উনি হাত সরিয়ে নেবেন কখন। তাঁর চোখের দৃষ্টি অনুভব করছিলাম আমার মুখে। শেষে তিনি বলতে লাগলেন তাঁর স্বরে তীব্রতা।

"জানি, তুমি আমার কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারবে না। —না, না, দুঃখ কোরো না—এ তোমার সংস্কার, তোমার শিক্ষা। শোন কথা বলতে আমি চাই না, শুধু এইটুকু চাই।—যদি আমার সঙ্গে নতুন পথে চলতে চাও তাহলে মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাও। আর কিছু তো নয় লক্ষ্মিটি।

তাঁর শান্ত দৃষ্টি আমার চোখের ওপর নেমে এলো। দৃঢ়সংবদ্ধ তাঁর হাত। কি বলতে চান উনি? কই, মার শেখানো বুলিতো কোনো কাজেই এলো না। তাঁর স্ত্রী তো হতে হবে। তাঁর সন্তানের জননী হব এই তো আমার কামনা। এবার শুরু হলো আমার দুঃখ—তারই জ্বালায় জ্বলছি দিবারাত্রি। কি করব, তখন তো ভেবে পেলাম না। মূর্খ আমি মাথা নুইয়ে জানালাম সম্মতি।

হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমি কৃতার্থ হলাম। "তুমি এখানেই শোও। আর একটি কথার পর আমি আজকের মত বিদায় নেব। শোন, ভয়কে জয় করতে হবে তোমার, তবে তো আসবে শান্তি, ঘুমোও, লক্ষ্মিটি। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

তিনি চলে গেলেন।

হে মা কোয়ান-ইয়েন আমাকে একটু দয়া কর মা! আমি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। বাড়ি ছেড়ে একা কখনো কাটাই নি। কি ভয়ই করতে লাগলো। দৌড়ে দোর অবধি গেলাম! মার কাছে যদি যাই? বন্ধ দরজায় হাত দিতেই মনে হলো, সে পথ আর নেই। একে ত পথ চিনি না, তারপর যদি কোনো রকমে বাড়ি গিয়ে পৌঁছুনো যায়, তো এ পোড়া মুখ দেখাবো কি করে? মা কি বলবেন? হয়তো, না, হয়তো নয়, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আবার জোর করে স্বামীর ঘর করতে পাঠাবেন! আমি তো আর তাঁর কেউ নই!

কি আর করবো। বিয়ের পোশাক খুলে ভাঁজ করে রেখে মশারি-ঢাকা বিরাট পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়লাম। চারিদিক নিঝুম। গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করছিল, কানে বাজছিল অর্থহীন প্রলাপের মত স্বামীর কথাগুলো। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

ভোরে উঠে অপরিচিত বিছানায় নিজেকে দেখে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ তো সব ভুলেছিলাম। এবার দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়লো, বিয়ের কথা, স্বামীর কথা···। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম। ঝি গরম জল নিয়ে এলো, মুখে হাসি; ঘরের এদিক-ওদিক সে তাকাচ্ছে। আত্মসম্মানবোধ চাড়া দিয়ে উঠলো। মার মেয়ে তো! স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি, একথা' কাউকে জানানো হবে না—না, না, না! বললাম, 'উনি পাশের ঘরে পোষাক বদলাচ্ছেন, ওঁর ওখানে জল দিয়ে এসো।'

লালরঙের পোশাক পরলাম আর কানে সোনার দুল। আমি যে গরবিনী, পরবো না!

বোন,

অনেকদিন পরে আবার এলাম। কত যে গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেল কি বলব!

স্বামীর পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এখন আমরা আলাদা বাসায় আছি। ভাবতে পার বোন একথা? উনি কিনা শ্বাশুড়ী-ঠাকুরুণের মুখের উপর বলতে পারলেন, ওঁর স্ত্রীকে উনি চাকরবাকরের মতো খাটাতে দেবেন না। ওঁর মার অমন কড়া শাসন নাকি আমার উপর চলবে না! ভাবতে পার?

না, না, এমন কিছু ঘটনা নয়। বিয়ের গোলমাল চুকে গেলে ভাবলাম, শ্বাশুড়ীর একটু আদর-যত্ন করা দরকার। তাই একদিন ভোরে চাকরদের দিয়ে একঘড়া গরম জল করিয়ে শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়ে বললাম, "মা, আপনার স্নানের জল এনেছি।"

তিনি তখন সাটীনের লেপের নীচে বিরাট পাহাড়ের মতো পড়ে আছেন। আমি তাঁর মুখের দিকেও তাকাতে সাহস করিনি। কোনো রকমে সেখান থেকেই তিনি হাত মুখ ধোয়া সারলেন। তারপর আমাকে ইঙ্গিতে ঘড়া সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। এবার সরিয়ে নিয়ে যাব, ওমা, মশারি না কিসে বেঁধে সে যা কাণ্ড! না, ভয়েই একাণ্ড করলাম। জলে শ্বাশুড়ীর বিছানা ভেসে গেল। ভয়ে তো কাঠ হয়ে গেলাম! শ্বাশুড়ী-ঠাকুরুণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "যেমন ধিঙ্গী বউ, তেমনি তার চলা-ফেরা!"

জানতাম, ওজুহাত দেখিয়ে ফল হবে না। তাই ঘড়াটা নিয়ে কোনো রকমে চোখের জল সামলে বেরিয়ে এলাম। আমারই তো দোষ। বেরিয়ে যখন আসি, দেখি স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানা কেমন ভার ভার। ওঁর মাকে খুশি করতে পারি নি বলে উনি হয়তো রেগেছেন। হয়তো বা বকবেন। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঘড়াটা চলকে—'

স্বামী বাধা দিলেন—'তোমায় দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু বাড়িতে এত ঝি-চাকর থাকতে তুমি এসব করতে গেলে কেন?' আমার স্ত্রী ঝি-চাকরের কাজ করবে তাতো হবে না। মার তো একশটা ঝি-চাকর আছে। চোখের জল মুছতে ত পারলাম না, বরং আরো যেন বেশি করে ঝরতে লাগলো।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মার উপদেশে শাশুড়ীর পরিচর্যা করতে গিয়ে আমিই গোল বাধিয়েছি। শাশুড়ীর পরিচর্যা, তাঁর কাছে থাকা—আমারই কাজ। বিনীতভাবে উঠে দাঁড়াব তাঁর সুমুখে। তাঁকে হাত ধরে তাঁর আসনে নিয়ে গিয়ে বসাব। তাঁর চায়ের পাত্র মেজে এনে সবুজ চা তৈরি করে তাতে ঢেলে দেব, তারপর দুহাতে করে সাবধানে নিয়ে এসে তাঁর সুমুখে রাখব। তিনি যা হুকুম করেন তাই-ই করব। তিনি তো আমার মা, বকুনি দিলেও আমি চুপ করে সয়ে যাব। কিন্তু স্বামী যেন কি! তিনি এসব বলতে দিলেন কোথায়?

অমনি বাড়ি ছাড়বার হুকুম হলো। কিন্তু মুখের কথায় তো আর ছেড়ে চলে আসা যায় না। ওঁরা তো তাঁকে থাকতেই বললেন। স্বামীর বাবা (আমার শ্বশুর) তিন তিনবার তাঁর সাদা দাড়ি চুমড়ে বললেন, 'এতো তোমারই বাড়ি। কোন্ দুঃখে ছাড়বে? তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। খেটে খেতে কখনো হবে না। স্বচ্ছন্দে বসে বই পড়, আমোদ আহ্লাদ কর। বৌমা তোমার সন্তানের মা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকুন। তিন পুরুষ মিলে এক ভিটেয় থাকা, এতো ভগবানের আশীর্বাদ।'

আমার স্বামী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, বাপের সামনে মাথাও একবার নোয়ালেন না! 'বাবা, আমি কাজ চাই। আমার পেশা বিজ্ঞানীর—পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সেরা পেশা। চুপ করে বসে থাকবার জন্য এ বিদ্যা আমি শিখি নি। আর ছেলের বাপ হওয়াও আমার জীবনের

প্রধান কাম্য নয়। আমি চাই আমার বিদ্যাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাতে,—সেই তো আমার সফলতা। একটা কুকুরও সন্তানের জনক হতে পারে, মানুষ হয়ে যদি তাই করবো, তা'হলে তাতে আমাতে প্রভেদ কোথায়?'

নীল পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাপ-ছেলের কথাবার্তা শুনে ভয়ে শিউরিয়ে উঠছিলাম। বিদেশী শিক্ষা না পেলে এমন করে বাপকে অপমান করতে সাহস করতেন কি? এই তো পশ্চিমী শিক্ষার ফল। বহুদিন ওখানে কাটিয়ে এসেছেন কিনা। এখন তো যুবকরা নাকি গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না। তাইত উনি অমন হয়েছেন। বাপের অবাধ্য হলেন তো। বিদায় নেয়ার সময় বোধহয় রাগ পড়ে গিয়েছিল। স্বামী তখন খুব ভদ্রভাবেই বললেন, তিনি যেখানে যে-ভাবে থাকুন না কেন, পুত্রের কর্তব্য তিনি করবেনই।

যাহোক, আমাকে তো শ্বশুরের ভিটে ছাড়তে হলো।

এমন বাসাও তো দেখি নি জন্মে। একফালি উঠোন নেই। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ঘর, আর তার চার পাশে ছোট ছোট ঘর। একপাশে সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে। মাগো, উঠতে গেলে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। কাঠের রেলিংটা আঁকড়ে ধরে একপা, একপা করে সেদিন তো উঠলাম। কিন্তু নামতে আর পারিনা, যা খাড়া। আমার তো আর অমন খাড়া সিঁড়িতে ওঠার অভ্যাস নেই। কি আর করি, বসে বসে নামতে লাগলাম কাঠের রেলিং ধরে। জামায় খানিকটা রঙ্ লেগে গেল, জামাটা তাড়তাড়ি বদলে ফেললাম, কি জানি, উনি যদি হাসেন দেখে। ওঁর আবার যা হাসি। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন। আমার তো ভয়ই লাগে!

জিনিসপত্র সাজাতেও তো জানি না, বাপু। জায়গাই বা

কোথায়? বিরাট এক টিক কাঠের টেবিল আর চেয়ার বাবা বিয়ের যৌতুক দিয়েছিলেন। স্বামী পাশের একটা ঘরে সেগুলোকে রাখলেন। উনি আবার তাকে 'ডাইনিং রুম' বলেন। বিয়ের খাটটা যে কোথায় রাখবেন ভেবেই পেলেন না। ভেবেছিলাম ঐটেতেই জন্মাবে আমার সন্তান। কিন্তু ওকে রাখার জায়গা তো নেই। শেষে খাবার ঘরেই ওটাও চালান দেওয়া হলো। কি আর করবো বোন, ঝি-চাকরের মত বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে। আর উনি লোহার একটা বেঞ্চিতে শোন পাশের ঘরে। সময়ে সবই সয়ে যায় বোন।

বড় একটা ঘর কি ছিল না?—উনি সেটাকে বসবার ঘর করেছেন। কয়েকখানা বেতের চেয়ার আর পঞ্জি সিক্কে ঢাকা একটা টেবিল আর খানকয়েক বই সেখানে রইলো। বড়ই বিশ্রী দেখতে হলো, না বোন?

বসবার ঘরের দেয়ালে বিদেশী বন্ধুদের কয়েকখানা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আর কি-একটা হিজি-বিজি লেখা কাগজ টাঙিয়ে রাখলেন। শুধোলাম, ওকি তার ডিগ্রি নাকি! তিনি হেসে আমাকে ডিগ্রি দেখালেন। বড় হরফগুলো তাঁর কলেজের নাম, বাঁকাগুলো তাঁর বিদ্যের পরিচয়। তা' বোন, সেও তো কম নয়। আমার স্বামী তাহ'লে প্রকাণ্ড বিদ্বান! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি আমাদের উপকথার হান-লনের মতো বিদ্বান নাকি। তিনি হেসে বললেন, বিদ্যের তুলনা করা যায় না।

পুরোপুরি বিদেশী কেতায় সাজানো বাড়ি। কাচের শার্সী, তার ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়ে দেওয়ালের গায়, আসবাবপত্রের ওপর। এমন পোড়া রোদ আমার সহ্য হয়না বাপু! এতটুকু ধুলো জমলেও টের পাই। আর পোড়াকপাল। একটু যে পাউডার ঘষবো

গালে, ঠোঁটে সিঁদুরে রং লাগাবো, তারো কি জো আছে! পোড়া রোদ! স্বামী ধরে ফেলেন, বলেন, 'ছিঃ ওসব ছাইভস্ম মেখো না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের চাইতে বড় সৌন্দর্য্য আর নেই। আর আমি তাই ভালবাসি।

বাঃ—ওঁর চোখে সুন্দর হব কি করে, যদি সিঁদুর না মাখলাম ঠোঁটে, গালে না দিলাম পাউডার! তাহলে তো প্রসাধন দ্রব্য শিকেয় তুলে রাখতে হয়। সৌন্দর্য্যকে দিতে হয় বিদায়। চুলেও কি তেল দেব না? চকচকে পালিস হবে না চুল? জরীর জুতো না হয় নাই পরলাম! আমাদের বাড়িগুলিতে তো অমন কড়া রোদ কখনো আসে না, রোদ ঝিলিমিলি দিয়ে চলকে পড়ে—কেমন যেন ম্লান তার আলো। মেয়েদের মুখে পড়ে সে তাদের আরো সুন্দর করে তোলে। কিন্তু তাতো এখানে হবার জো টি নেই। কি জানি, কি করে যে সুন্দর দেখাবে আমাকে!

জানালাগুলোও কেমন যেন। বোকার মত তৈরি! স্বামী সাদা কাপড় কিনে এনে জানলা ঢাকবার জন্যে পর্দা তৈরি করতে হুকুম দিলেন। দেয়ালে গর্ত খুঁড়ে বড বড় কাচ বসানো হলো, তারপরে তার উপরে ঢেকে দেওয়া হলো পর্দা দিয়ে। কাচের জান্‌লায় আবার পর্দা! কি জানি!

কাঠের মেঝেয় স্বামীর বিদেশী জুতোর অদ্ভুত শব্দ ওঠে। স্বামী শব্দ বন্ধ করবার জন্য প্রকাণ্ড একটা পশমী কাপড এনে মেঝে ঢেকে দিলেন। আমার ত পা দিতেই ভয় হয়, কি জানি যদি খারাপ হয়ে যায়। ঝি-টাকে সাবধান করে দিই, থুথু না ফেলে! একদিন ওকথা বলতে স্বামী চটে উঠলেন, 'কেন তারা কি মেঝেয় থুথু ফেলে নাকি?'

'কোথায় ফেলবে তা'হলে?'

'কেন, বাইরে।'

কিন্তু ঝির পক্ষে সেটা কিরকম অসম্ভব তাতো আর তিনি জানেন না। আমারই তো মুখ থেকে মাঝে মাঝে তরমুজের বীচি কাপড়ের ওপর পড়ে যায়! শেষে তিনি ছোট ছোট বয়েম এনে থুথু আর বীচি ফেলতে দিলেন। বাধ্য হয়েই এখন ঐ বয়েমে ফেলতে হয়। নিজে তো রুমালেই ফেলেন। তারপর রুমালটা পুরে রাখেন পকেটে। কি ঘেন্না! এও এক নোংরা পশ্চিমি অভ্যেস বোন!

[চার]

স্বামীর, ঘর, না জেলখানা! এক এক সময় মনে হয় বোন, এই জেলখানা থেকে যদি পালাবার উপায় থাকতো! কোথায় যাব? মা-তো আর ঠাঁই দেবেন না! দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ দিন এমনিধারা কেটে যাচ্ছে। দিন-মজুরদের মত উনি তো সারাদিন বাইরে কাজে থাকেন। ঝি চাকরাণী কি আর নেই। কিন্তু ওদের সঙ্গে গল্প করতে যাব আমি!

এর চাইতে শ্বশুরের ভিটে ছিল ভাল। দু'চারখানা মুখ তবু দেখা যেত, দু-চারটে কথাও শোনা যেত। কিন্তু একেবারে একা, সমস্ত বাড়িতে একটা কাক-পাখীও নেই। কে বলবে যে উনি বড় মানুষের ছেলে। উনি যেন রুজি-রোজগেরে মজুর! সেই কোন্ ভোরে রোদ যখন একটু গরম হয়ে উঠলো, তখন কাজে বেরোন, ফেরেন সেই সন্ধ্যেয়। সারাদিন বাড়িতে একা পড়ে থাকি। রান্নাঘরে সব অচেনা অজানা ঝি চাকর। ওদের গল্প-গুজব শুনতে লজ্জা করে। এক হয় ওদের কারো সঙ্গে যদি গল্প করি। কিন্তু আমি গল্প করতে যাব? না বোন, মার কাছ থেকে অন্তত সেটুকু সহবৎ তো শিখেছি। হাসি নেই, আলাপ নেই। কারো স্বরও শোনা যায় না। সারা বাড়ি নিঝুম। সেখানে কুয়াশার মতো যেন ঘিরে থাকে নীরবতা। তাই সারাদিন শুয়ে শুয়ে ভাবি। সেও ওই একই ভাবনা—স্বামীর মন পাওয়া। সেই স্বপ্নই দেখি।

সারারাত ভাবনায়-ভাবনায় ঘুমই আসে না। ভোর বেলা উঠে পড়ি। তাঁর সামনে যাব, একটু ফিটফাট হয়ে তো নিতে হবে। সারা রাত অস্থিরভাবে কাটালে কি হবে! গরম জলে সুগন্ধি মিশিয়ে মুখ-

হাত পা খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলি। আর সুগন্ধি একটু তেল দিয়ে মুখখানা ঘসে মেজে নিই। রোজই মনে হয় আজ বুঝি ভোরেই ওর মন জিনে নেব, উনি প্রথম উঠেই দেখবেন আমাকে। কিন্তু তাতো হয় না। রোজই দেখি, উনি কখন উঠে পড়তে বসেছেন!

রোজই এমনি হয়। ওর ঘরের সামনে গিয়ে একটু কাসি, তারপর হাতল ঘুরিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে ফেলি। হাতলটা গোল, আবার ঘোরাতেও কি কষ্ট, অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলবার কৌশলটা জেনেছি বোন। উনি তো আমার এই হাতল ঘোরানো দেখে চটে ওঠেন। তাই উনি যখন থাকেন না তখনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিখে নিয়েছি। কিন্তু কতদিন ভোরে আঙুল কড়ির হাতলেরউপর পিছলে গিয়ে এক কাণ্ডই বাঁধিয়েছে। তারপর তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়েই বা কি ভয়! উনি আবার কোনো কিছু ধীরে ধীরে করা পছন্দ করেন না। যখন হাঁটেন, শরীরটা তো জোরেই চালান। আমার তো বোন ভয় হয় কখন কিসে ধাক্কা খেয়ে বসেন। কিন্তু তবু ওঁর হুঁস নেই।

দিনের পর দিন ওঁর ঘরে ঢুকে চা নামিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়াই। উনি বই পড়ছেন তো, বই ই পড়ছেন। একবার মুখ তুলে তাকাতেও কি দোষ? কেন যে ছাই ঝিকে পাঠিয়ে সাত-সকালে তাজা যুঁই ফুল এনে খোঁপায় গুঁজে ছিলাম! বই পড়াই কি সব, যুঁই-এর গন্ধ ওর চেয়ে খারাপ নাকি! কত দিন তো দেখেছি, বই পড়তে-পড়তে চা-ই জুড়িয়ে হিম হ'য়ে গেছে। পাত্রের ঢাকনাই তিনি খোলেন নি। জলের ভিতরে চা পাতা ভাসছে। বই পড়া ছাড়া ওঁর আর কিছু আছে নাকি!

স্বামীর মন পাবার জন্যে মার সমস্ত উপদেশ কাজে খাটিয়ে দেখেছি, ফল পেলাম কই? চাকর পাঠিয়ে হঙ্-চাউ থেকে বাঁশের কোঁড়, ম্যাগডাবিন মাছ, আদা, বাদামি রঙের চিনি আর সয়াবীন কিনে এনে

কত চব্য, চোষ্য রেঁধে দিয়েছি, মুরগী সত্য মেরে তারই সুরুয়া তৈরী করে দিয়েছি, ভেবেছি উনি হয় তো চেঁচিয়ে উঠবেন, বলবেন, আরে এযে রাজভোগ এনে হাজির করেছ! কিন্তু উনি নির্বিকার ভাবে খেয়ে গেছেন, ভালো-মন্দ কিছুই বলেন নি। মনে হয়েছে বাঁশের কোড়ের ডালনায় আর গোরুর খাবার বাঁধাকপির বুড়ো পাতায় তফাৎ কি তিনি বুঝতে পারলেন না। নির্বিকারভাবে চিবিয়েই চলেছেন। মানুষ তো স্বাদটাই খায়। সেই স্বাদ নেই ওর জিভে! রাতে বিছানায় শুয়ে ভেবেছি, ওগুলো হয়তো তিনি ভালবাসেন না। আচ্ছা, কাল ওঁর মার কাছ থেকে জেনে আসবো, কি খেতে উনি খুব ভালবাসেন। তার পর দিন তাই রান্না করেছি, তাতেও কি প্রশংসা পেলাম!

ওঁর মা ঠিকই বলেছেন। পশ্চিমী হাওয়া লেগে ওঁর ভালোমন্দের বিচারশক্তি উঠে গেছে। আগে তো নাকি কড়া ভাজা হাঁসের মাংস বুনো জামের রসে ভিজিয়ে খেতে ভাল বাসতেন। কিন্তু পশ্চিমের মানুষদের আধ সেদ্ধ, আধ কাঁচা খাবার খেয়ে খেয়ে উনি জিভের স্বাদ হারিয়ে ফেলেছেন। এখন আর তাঁর এসব ভাল লাগে না।

না, তারপর আর চেষ্টাও করি নি। কি হবে? স্বামী আমার কাছে কিছু চান না।

নতুন বাসায় আসবার প্রায় পনেরো দিন পরে এক সন্ধ্যে-বেলা উনি বসে বসে একখানা মোটা বই পড়ছিলেন। পাশের চেয়ারে বসতে গিয়ে দেখি, ওমা এযে এক মানুষের ছবি। ভয়ে শিউরিয়ে উঠনু। চামড়া নেই—শুধু হাড় আর মাস! উনি এসব বই পড়েন! কিন্তু জিজ্ঞেস করবার মতো সাহসে তো কুলালো না। বেতের চেয়ারে ওঁর পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়লাম। সভ্য-ভব্য হ'য়েছি বোন, হেলান

দিয়ে বসি না সবার সমুখে। বসি, যে-কোনা পশ্চিমী কেতাদুরস্ত মেয়ের মত। উনি টেরও পান নি, আমি এসেছি। নিঃশব্দে বই পড়তে লাগলেন। ওদিকে আমি বসেই রইলাম। মার কথা খুব মনে পড়ছিল। এখন হয়ত বাড়িতে ঘরে ঘরে মোমের বাতি জ্বাল্যান হয়েছে। খাবার জায়গায় জড়ো হয়েছে সবাই। উপপত্নী আর তাদের ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করছে; মা বসে আছেন সেরা আসনটিতে। ঝি চাকরদের ডেকে কোথায় শাক-সবজি আর ভাতের পাত্র রাখতে হবে বলে দিচ্ছেন। ভাত খাবার কাঠি সবার আসনের পাশে পাশে ছড়ানো। সবাই খেতে ব্যস্ত, খুশি মনেই খাচ্ছে। বাবা অন্দরমহলে এলেন খাওয়া-দাওয়ার পরে। উপপত্নীদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু খেলা করলেন। এবার ঝি চাকররা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এধার-ওধার করছে থালা বাসন নিয়ে। কেউবা কাজ সেরে উঠোনে চাঁদের আলোয় বসে ফিস্ ফিস্ করছে! মা রোজকার হিসেব মেলাচ্ছেন খাস বাবুর্চির সঙ্গে বসে। মোমের আলোর দীর্ঘ ছায়া তাঁর মুখের উপর পড়ছে।

কি ইচ্ছেই যে করে মার কাছে যেতে! তেমনি পদ্ম আজও ফুটেছে ছোট্ট পুকুরটায়; ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মনে হয় ছুটে যাই। ঘুরে ঘুরে বেড়াই ফুলের মাঝে। এখন তো গ্রীষ্মের শেষ, পদ্মের মৃণাল তো এখনি লোকে খায়। মনে পড়ে, এমন রাতে বীণা বাজিয়ে পুরোনো কবিদের কতো বিরহের গান গেয়েছি। মা তো এমনি গ্রীষ্মের রাতে চাঁদ উঠলেই বীণা নিয়ে এসে বাজাতে বলতেন। তাঁর পছন্দ-মাফিক গান গাইতাম। তিনি আস্তে আস্তে তাল দিতেন গানের সঙ্গে সঙ্গে।

বীণার কথা মনে পড়লো। উঠে বীণা বার করলাম। অনেক-দিনতো ওতে হাতই দিই নি। ঝিনুক-দিয়ে-গড়া আটটি রাগিণীর মূর্তির ওপর হাত বুলোলাম। তারের নিচে কত রকমের কাঠ লাগানো,

তার যখন রনন ঝনন করে বাজে তারা তো সুরকে আরো সুন্দর করে তোলে। কত পুরোনো এই বীণা—এখনো ঝক্‌ঝক্ করছে। ঠাকুর্দা ঠাকুরমার জন্যে কোথাও-টাও থেকে এনেছিলেন! ঠাকুরমা পা বাঁধতে গিয়ে ভারি কষ্ট পেয়েছিলেন। শুধু কাঁদতেন। যেদিন তার কান্না থামলো সেই দিন ঠাকুরর্দ দিলেন এই বীণাটি উপহার।

বীণায় ঘা দিলাম আঙুল দিয়ে। মৃদু, খুব মৃদু ঘা, বিষাদের সুর যেন রিন্ ঝিন্ করে উঠলো। এই বীণা, একি আর বিদেশী কেতায় সাজানো এই ঘরে বসে বাজান চলে। মনে হয়, কে যেন গলা টিপে ধরছে সুরের। তার চেয়ে শান্ত রাতে বুকে, নদীর ধারে, মিঠে জ্যোৎস্নায় চল। গাছের ঘন ছায়ায় বসে শুভ্র জলরাশির দিকে তাকিয়ে বাজাও, বাজাও, আরো বাজাও। সুর আকুল করে দেবে। দূর, সে ভাগ্য করে কি এসেছি! এই বদ্ধ খাঁচায় বসেই বাজাব। সুঙ্ আমলের একটা সুর বাজালাম!

স্বামী তাকালেন।

"অপূর্ব!" তিনি ব'ললেন, "অপূর্ব তোমার বাজনা! তোমাকে একটা পিয়ানো কিনে দেব, তুমি আমাকে পশ্চিমী গৎ বাজিয়ে শোনাবে।"—তারপর আবার সেই অদ্ভুত বইটায় ডুবে গেলেন।

তাকিয়ে দেখলাম একবার। হাত আবার উঠে এল বীণার তারে। জানি না কি সে সুর আমার বীণায় ঝঙ্কার তুললো। পিয়ানো তো জন্মেও দেখিনি। ঐ বিদেশী বাজনা নিয়ে কি করবো? বাজাতে লাগলাম, কখন যে থামলাম জানি না। এবার বীণা রেখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। দীর্ঘ ছেদ। স্বামী এবার মোটা কেতাবখানা বুজিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

"কিউই-লান"! স্বামী ডাকলেন।

আনন্দে বুকখানা ভরে গেল। এই প্রথম উনি আমাকে ডাকলেন

নাম ধরে। মাথা নীচু করে রইলাম, তারপর মুখ তুলে ওঁর চোখের দিকে তাকালাম। তিনি ব'ললেন,

"পা বেঁধে রাখলে এই অবস্থা হয়। তোমাকে বিয়ের পর থেকেই একথা বলব ভাবছিলাম। দেখ, তোমার পায়ের হাড় ঠিক এমনি হয়ে গেছে।"

চোখ চেয়ে দেখি, একটা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে পার মত কি একটা এঁকেছেন! উনি কেমন করে জানলেন? কারো সমুখে পা দেখানো তো চীনে মেয়েদের রীতি নয়! রাতেও তো সবাই সাদা মোজা পরে থাকে!

অবাক হ'য়ে বললাম, "আপনি জানলেন কি করে?"

উনি উত্তর দিলেন, "আমি যে ডাক্তার। কিউই-লান, নিজেকে আর কষ্ট দিও না। পা খুলে ফেল—ও তো বিশ্রী! আর চীনের ও প্রথাও উঠেও গেছে। বিশ্রী—বিশ্রী—যত—"। তিনি মুচকি হাসছিলেন। তাহলে আমার উপর নির্দয় নন স্বামী!

চেয়ারের তলায় তাড়াতাড়ি পা দু'খানা লুকোলাম। বিশ্রী! উনি তো বললেন, কিন্তু এযে চীনে মেয়েদের গর্ব! তাদের কৌলিন্যের পরিচয়! মা ছেলেবেলা থেকে তো আমার পা নিয়ে পড়েছিলেন। গরম জলে চুবানো, চেপে-চেপে বাঁধা—এসব তো তিনি দাঁড়িয়ে থেকে করাতেন। কাঁদলে বলতেন, "আজ কাঁদছ মা, কিন্তু একদিন পা দুখানির জন্যেই স্বামীর সোহাগ পাবে। দেখবে, সুন্দর পার কত প্রশংসাই করবেন।'

স্বামীর সোহাগ না ছাই! উনি তো বললেন, 'বিশ্রী!' কোনো-রকমে চোখের জল রোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কত কষ্টই না পেয়েছি পা দুখানার জন্যে! কত দিন আর রাত কেটেছে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে! কতদিন তো বিছানার ধারে বসে পা দুখানা ঝুলিয়ে

রাখতে হয়েছে। তারপর বছর খানেক হলো পা ঠিক হয়ে গেছে। আর আজ কিনা উনি বললেন, বিশ্রী!

ব'লতে পার বোন, কি দিয়ে তাঁর মন ভোলাব? পা-দুখানির সৌন্দর্য দেখে তো তিনি ভুললেন না। কেন, পা কি আমার খুব খারাপ? সূক্ষ্ম কাজ করা মোজা আর জরির জুতো পরলে তো বেশ দেখায়! কিন্তু কি হবে এসবে। মন তো মিললো না!

আমাদের প্রথামত দু'সপ্তাহ পরে মার কাছে চলে এলাম। স্বামী কিন্তু আর পা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি। আদর করেও আর নাম ধরে ডাকেন নি।

[পাঁচ]

বোন,

এখুনি উঠবে কি ? একটু ধৈর্য ধরে শোন না !

কটা দিনতো মাত্র নেই, তবু বাড়ির ফটকের কাছে এসে মনে হলো, সবই যেন বদলে গেছে ! হয়তো আমিই বদলে গেছি ! আমি বিবাহিত ; চুলের গোছার বদলে বেণী ঝুলছে ; কপালের চুল আঁচড়ে তুলে দিয়েছি। কিন্তু মনে তো কোনো পরিবর্তন নেই ! তেমনি ভীরু, নিঃসঙ্গ মেয়ে, তেমনি নিরাশার জাল বুনে চলেছি।

আমাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে সদরের উঠোনে মা এসে দাঁড়ালেন, কেমন যেন বুড়িয়ে গেছেন এই ক'দিনে ! রুপো বাঁধান বাঁশের লাঠিটা তাঁর হাতে। মনে হয় ভর না দিয়ে চললে এখুনি ভেঙে পড়বেন। ক'দিন তাঁকে দেখিনি বলে কি তাই মনে হলো। তাঁর চোখের দৃষ্টি বিষন্ন, তাই তো সাহস হলো। তাঁকে প্রণাম করে, নিজের হাতে হাতখানা তুলে নিলেম। আদর করে চেপে ধরলেন হাত। আগেও এত আদর কখনো পাই নি ! দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাড়িতে ঢুকলাম।

বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। সব কিছুই দেখলাম চেয়ে-চেয়ে। তেমনি উপপত্নীদের চিৎকার, ঝি-চাকরদের তেমনি ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি—সবই তেমনি আছে—তবু যেন কোথায় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি, এ আমারই পরিবর্তন ! আমি আর এ বাড়ীর কেউ নই ! তবু তো ভাল লাগলো সবকিছু। প্রথম শরতের আলো এসে পড়ছে দেয়ালে, ফুলে ফুলে, বারান্দার টালির উপরে ;

ঝোপে ঝাড়ে, ঝিলে তারই খেলা। দক্ষিণের জানালা খোলা। আলো আর উষ্ণতা নিয়ে এসেছে রোদ, চলকে পড়ছে কড়িকাঠে, দেয়ালে। আমার ঠাঁই এখানে নেই। কিন্তু তবুতো এখানে রইলো আমার আত্মা। তাকে আমি রেখে গেছি এখানে, হারিয়ে গেছি।

মার কাছে এসে বসলাম। তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'একটা কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম, "লা-মে কোথায়, মা?"

"তাকে"—মা তামাক টানতে টানতে বললেন, "হাওয়া বদলাতে পাঠিয়েছি।"

তাঁর স্বর শুনে বুঝলাম, লা-মেকে নিয়ে কোনো একটা ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার আর সাহস কোথায়?

সন্ধ্যেবেলা ওয়াঙ্-ডা-মা যখন চুল বেঁধে দিতে এলো আমার ঘরে, তখন সবই শুনলাম। বুড়ি নানা আজে-বাজে গল্পের পর বললে, "তা বুঝি শোন নি। তোমার বাবা আর একটি জুটিয়েছেন। পিকিঙ্-এর মেয়ে। খুব বিদ্বান, শুনেছি জাপানে পড়ত। লা-মে তো এই খবর শুনে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলো। কানের দুল গিল্লো হতভাগী। দুদিন গেল, কষ্টও খুব, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বললে না। তারপর তো যায় যায় অবস্থা। ডাক্তার এলো, হাত আর হাঁটুতে ছুঁচ ফুঁড়লো। কিন্তু কিছুই হলো না, পড়শিরা হাসপাতালে দিতে বললে, কিন্তু তোমার মা গররাজি। বিদেশি কি করে বুঝবে একজন চীনা মানুষের কি হয়েছে। ওরা নিজেদের জাতের অসুখই বুঝতে পারে। তোমার দাদা চন্দ্রোৎসবে বাড়ি এসেছিল, সেইতো বিদেশী মেয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো। বাক্স থেকে একটা বিদ্‌ঘুটে অস্তর বার করে গলায় পুরে দিলে। দেখতে দেখতে দুল বেরিয়ে এল! কী কাণ্ড, কারো তো মুখে রা নেই! শুধু মেয়ে ডাক্তারটা যেন কিছুই হয়নি, এই ভাব দেখিয়ে বাক্স নিয়ে চলে গেল।"

বুড়ির কাছেই শুনলাম, উপপত্নীরা খুব রেগে গিয়েছিল। কানের দুল গিলে ফেলে—কী অসম্ভব কথা। প্রথমা লা-মেকে বলেই বসলো, "আত্মহত্যাই যদি করবি, দেশলায়ের বারুদ জোটে নি! এক বাক্সের দামই বা কত! অমন মাগগি জিনিস দুল—তাই কিনা টুপ করে গিলে ফেললি?"

লা-মে কোনো উত্তর দেয় নি।

এই কাণ্ডের পর লা-মে সারাদিন শুয়ে কাটাত। ভালো করে খেত না, কারু সঙ্গে কথা বলতো না। মাথা তো ওঁর হেঁট হলোই, এই ধকলে সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে গেল। মা দূরে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন, নইলে হয়তো গলায় দড়ি দিত!

ওয়াঙ্-ডা-মাই এই সব খবর দিলে। নইলে মার কাছে এসব নিয়ে কথা বলতে যাব কোন্ সাহসে? এগুলি তো বাড়ির ছোটখাটো ব্যাপার। বাড়িকে ভালবাসি বলেই তো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলাম। ও তো বহুদিনের মানুষ। সান্শিতে মার বাপের বাড়ি। সেখান থেকে বিয়ের পরে মার সঙ্গে আসে। মার ছেলেমেয়েকে সেই তো মানুষ করেছে। মা চলে গেলেও হবে দাদার বৌয়ের খাস চাকরাণী। দাদার ছেলেমেয়েদেরও মানুষ করবে।

দাদার খবরও ওর কাছেই পেলাম। এত আজে বাজে খবরের মধ্যে এই একটাই আসল। মা কি পরিবারের কোনো কথা ভাঙেন! বাপের বাড়ি এসেছি; তারপর দিন সকালে গরম জল দিতে এসে ওয়াঙ, ডা-মা বলে গেল; বাবা নাকি দাদাকে আমেরিকা পাঠাতে রাজি হয়েছেন। অথচ প্রথমে তো ওর কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। আজকাল চীনের বড় বড় ঘরে নাকি ওটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। মা একথা শুনে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন। বাবা যখন প্রথমা উপপত্নীকে ঘরে নিয়ে আসেন, তখন নাকি মার এমনি অবস্থা হয়েছিল—

ওয়াণ্ড-ভা-মা তো তাই বলে। প্রথমে কথাটা তিনি বিশ্বাস করতেই পারেন নি। যখন যাওয়ার দিন সত্যিই ঘনিয়ে এলো, তিনি তিন দিন তিন রাত না খেয়ে রইলেন। কারো সঙ্গে কথা কইলেন না। তারপর যখন বুঝলেন সে শান্তির সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেই, তিনি প্রস্তাব করলেন, তাকে আগে বাগদত্তা বধূকে বিয়ে করতে হবে। বৌয়ের বেটা হোক তাবপর যেন সে যায়। তিনি দাদাকে ডেকে বললেন :

"তুমি ত মস্ত বিদ্বান! কিন্তু একথা কেউ কি ভুলেও শেখায় নি যে, তোমার রক্ত-মাংসের শরীর একা তোমার নয়। যাক্, যখন সে সব ভুলে গিয়ে অসভ্য দেশে চলেছ, আমি বাধা দেব না। যাবার আগে, একটি বিয়ে করে তোমার পিতৃপুরুষের বংশরক্ষার উপায় করে যদি যাও, আমি সুখী হব। অনুরোধ রাখবে? তা'হলে দেখ বিয়ের যোগাড় দেখি!

দাদাটা কি একগুঁয়ে! বলতে পারল কিনা, "এখন বিয়ে করার আমার ইচ্ছে নেই! আমি বিজ্ঞান পড়ে জগতের রহস্য আবিষ্কার করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ফিরে এসে তোমার কথা রাখবো, এখন নয়।"

মা বাবার কাছে খবর পাঠালেন, ছেলের বিয়ে দেয়া চাই। বাবা তখন নতুন উপপত্নীর মোহে মত্ত। উত্তর দিলেন না। দাদা নিজের যা খুশি করলো। আমেরিকা চলে গেল।

মার জন্য দুঃখ হয়। বহুদিনের পুরানো এই বংশ। আমার ঠাকুদার একমাত্র পুত্র সন্তান বাবা। মার ও কয়েকটি ছেলে ছেলে-বেলায় মারা গেছে। তাই তো দাদার উচিত ছিল তাড়াতাড়ি বিয়ে করে একটি পুত্র-সন্তান উপহার দেওয়া। তাহলে অন্তত মার পিতৃপুরুষের কর্তব্য রক্ষা হোত। দাদার যদি বিদেশে ভালো-মন্দ কিছু

হয়, বংশরক্ষার কি উপায় হবে? দী-দের মেয়ের সঙ্গে তো ওর বাগ্‌দান হয়ে আছে। তাকে দেখিনি তবে শুনেছি, দেখতে সুন্দরী নয়। সে দাদার যোগ্য নয় জানি, কিন্তু মার হুকুমের কাছে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাই উঠতে পারে না।

দাদার এই অবাধ্যতায় আমার মনেও বড় লাগল। মার জন্যে ভয় হোলো বেশি। তিনি তো আমার কাছে কোনো কথাই বললেন না। তিনি তাঁর আত্মার গোপন গুহায় লুকিয়ে রাখলেন সে ব্যথা, এই তো তাঁর রীতি। দুঃখ অবশ্যম্ভাবি হলে তিনি তো ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকেন। আর তাইতো রইলেন। আমি? আমিও পরিচিত মুখের সারের মাঝে দাদার কথা একদিন ভুলে গেলাম। দৈনন্দিনের দেয়াল আমাকে ঘিরে রাখলো। দাদা তো তার বাইরে। তাকে ভুলে গেলাম।

যা ভয় করেছিলাম তাই। সবার চোখে সেই এক আশা আর আশঙ্কা ছেলে: কবে হবে? সবই জিজ্ঞেস করে আর আমি মাথা নাড়ি। কাউকে তো জানতে দিতে চাই না—স্বামী আমাকে ভালবাসেন না। কিন্তু মাকে তো ভোলানো গেল না বোন!

বাড়ি এসেছি আজ সাতদিন। দাদা চলে গেছে। সেদিন রাতে দোরগোড়ায় বসেছিলাম। আবছা আলোয় চাকরদের ছুটোছুটি, ভাজা মাছের গন্ধ, সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ক্রীসান্থিমাম গাছগুলো—সব কিছু দেখে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ছিল। বাড়ির পুরানো পরিবেশ আমাকে ঘিরে ধরলো। হঠাৎ দরজায় হাত পড়লো, শিউরিয়ে উঠলাম। এই দরজা-খানাকেও আমি ভালবাসি। ওর উপরে হাত রাখলে আমার কেমন একটা আত্মনির্ভরতা ফিরে আসে। বাড়ির সব কিছুই এমনি প্রিয়। ঐ যে সন্ধ্যা নামছে ছাদে, কামরায় কামরায় জ্বলছে মোম, মসলার খোসবো ভরা রান্নার গন্ধ, ছেলেমেয়ের স্বর, টালি ছাওয়া মেঝের উপর

কাপড়ের জুতোর শব্দ, মৃদু শব্দ। এই সব কিছু মিলিয়েই তো আমার এই বাড়ি। আমি এই বাড়ির মেয়ে, আমার সত্তা জড়িয়ে আছে এ বাড়ির প্রতি ধূলিকণায়। আমি ছাড়লেও, এ বাড়ি আমাকে ছাড়বে না!

স্বামীর কথা মনে পড়লো। বিদেশী পোষাক পরে বিদেশী কেতায় সাজানো ঘরে বসে আছেন। আমি তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি আমাকে চান না। তাঁর জীবনে আমার তো কোন ঠাঁই নেই! পুরোনো সংস্কারের মতই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। জল চোখের মণিকোঠায় জমে উঠলো। উনি যাতে দেখতে না পান, তাই মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যার বর্তমান এই, ভবিষ্যতে তার কি আছে কে জানে! আগে তো কত ভেবেছি। ভবিষ্যৎ নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আজ এল সেই ভবিষ্যৎ কি ভয়ংকর রূপ নিয়ে।···এমন সময় খাবার ঘণ্টা পড়লো। চোখ মুছে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

মার শরীর অসুস্থ, তিনি শুতে গেছেন। উপপত্নীদের খাওয়া শেষ। একা বসে চা খাচ্ছিলাম। ওয়াঙ-ডা-মা এসে জানালো তোমার মা ডাকছেন গো।

অবাক হয়ে বললাম, ''তাঁর শরীর না অসুস্থ ?, কেন ডেকেছেন ?"

"কি জানি, কেন ডেকেছেন।" এই তো সবে সে-ঘর থেকে এনু, তিনি ডেকে দিতে বললেন।' ওয়াঙ-ডা-মা চলে গেল।

সাটীনের পর্দা সরিয়ে মার ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় শুয়ে আছেন। পাশে টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলচে। বড় ক্লান্ত তাঁকে দেখাচ্ছে, বড় ক্ষীণ, ঐ মোমের শিখার মতোই বুঝি। তাঁর চোখ বোজা, ঠোঁট চেপে আছেন। আমি আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্লান মুখ, গম্ভীর। কাছে গিয়ে আস্তে ডাকলাম, "মা!"

"বাছা!"

আমি বসব না দাঁড়িয়ে থাকব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিনি এবার হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর পাশে বিছানায় বসতে ইসারা করলেন। আমি বসলাম। চুপ করে আছি, কখন তিনি কথা কইবেন কে জানে। ভাবলাম, মা, দাদার জন্যে বড় দাগা পেয়েছেন! ওর কথাই ভাবছেন!

কিন্তু দাদার কথা তো বললেন না, বললেন আমার কথা।

"মা, মনে হয়, কি যেন তুমি আমাব কাছে লুকোচ্ছ। তোমার মনের সে শান্তি আর নেই! কেমন উদাস ভাব, চোখ দুটি সারাক্ষণ লাল। কোন ব্যথা পেয়েছ কি, মা? লুকিওনা, বল। যদি সন্তানের জন্য তোমার এই দুঃখ হয়, সে সময তো যায় নি। তোমার দাদা হয়েছিল আমার বিয়ের দু বছর পরে। ছিঃ, এর জন্যে মন খারাপ করে নাকি!"

কি বলবো ভেবে পেলাম না। মশারি থেকে একটা সুতো ঝুলছিল, সুতোটা নিয়ে আঙুলে জড়াতে আর খুলতে লাগলাম। মনের ভিতরেও তখন ভাবনা পাক খাচ্ছে আর খুলে খুলে যাচ্ছে।

বল কি হযেছে? তিনি আবার শুধালেন।

এইবার তাঁর চোখে চোখ পড়লো। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। হু হু করে চোখ দিয়ে জল গড়াল। মার লেপের ভেতরে মুখ গুঁজে বললাম, "কিছুই বুঝি না। তিনি আর আমি নাকি সমান! সেদিন বললেন, আমার পা দু'খানা বিশ্রী—স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। উনি এ কে দেখিয়ে দিলেন।"

মা উঠে বসলেন। "কি তুমি তার সমান—স্ত্রী স্বামীর সমান! এমন আজগুবি ব্যাপার কোথায় দেখেছে সে?"

"পশ্চিমে।" আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম।

"পশ্চিমে যা খুশি হোক, এখানে আমরা আমাদের ব্যাপার বুঝব। ছবি এঁকে দেখাল কেন?"

"বিশ্রী হয়ে গেছে কিনা তাই।" ফিসফিস করে বললাম?

"-তোমার পা! তুমি বোধ হয় যত্ন নাও নি। বিশ জোড়া জুতো দিয়েছি, কোন্‌টা কখন পরলে সুন্দর দেখাবে সেও আমি ব'লতে যাব ধিঙী মেয়েকে!"

ভয়ে ভয়ে বললাম—"না, তা নয়, তিনি সেদিন এঁকে দেখালেন—লোহার জুতো পরে পায়ের হাড় দুমড়ে গেছে।"

"দুমড়ে গেছে! মেয়েদের পায়ের হাড় কে কবে দেখেছে?" পুরুষের চোখ কি চামড়ার নীচেও দেখতে পায় নাকি?

"উনি যে ডাক্তার।"

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, "পশ্চিমী ভেল্‌কি!"

তারপর অজান্তে সব কথাই বলে ফেললাম। সব-সব বললাম। যে কথা লুকানো ছিল, অনেকখানি মনের বিষ নিয়ে তা ঝরে পড়লো। স্বামী আমাকে ভালবাসেন না, সন্তান চান না। তারপর বললাম সব চেয়ে সাংঘাতিক কথা। মাগো, বিয়ে হয়েও আজ পর্যন্ত আমি কুমারী!

মা নিজের ডান হাতখানি আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি বড় চাপা, কিছুই প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু এবার তিনি সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন—

"তোমার শিক্ষায় যে গলদ আছে, এ কথা আমার মনে হয় না। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের উপযুক্ত করে আমি তোমাকে গড়েছি। তোমার স্বামী অসভ্য, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত অসভ্য! সে না কুঙ্‌ বংশের ছেলে! কে জানতো মা, এমন হবে! তোমার দাদা যেন সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ডুবে মারা যায়!"

আর ব'লতে পারলেন না। চোখ মুদে এল। শুয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন—ক্লান্তিতে তাঁর স্বর জড়িয়ে আসছিল—"মা, মেয়েদের জীবনে একটা পথই খোলা আছে, সে স্বামীকে খুশি করা। আমার শিক্ষা তোমাকে ভুলে যেতে হবে, এই আমার দুঃখ। কিন্তু উপায় কি, তুমি তো আমার পরিবারের কেউ নও! তুমি তোমার স্বামীর। তিনি যা চান তাই করতে হবে। উপায় কি? তবে তার আগে একবারটি শেষ চেষ্টা করে দেখো, ওর মতি-গতি ফেরাতে পার কিনা। "স্বামীকে সাজ-সজ্জা করে ভোলানো তো দোষের নয় মা! সবুজ আর কালো পোষাক পরবে, পদ্মের সুগন্ধ মাখবে গায়ে। হাসবে, কিন্তু হো হো করে নয়, হাসিতে মিশে থাকবে লজ্জা, আর সে লজ্জা তো জানিয়ে দেবে স্বামীকে তুমি কি দিতে চাও সে কথা। ওর হাত ধরতেও পার, কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রেখোনা। ও যদি হাসে, তুমিও হেসো। কিন্তু—যদি দেখ, সে ফিরলো না, তার কথামত কাজ কোরো।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

অস্পষ্ট স্বরে বললাম, "আমার কি হবে? পা খুলে ফেলব?

"সময় বদলে গেছে, মা। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তোমাকে চলতে হবে। যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।

দেয়ালের দিকে মা পাশ ফিরে শুলেন।

———

[ছয়]

আমার কথা আর কি বলব বোন? স্বামীর ঘরে ফেরবার দিন এসে গেল।

ভোর হলো। ধুসর দিন, হাওয়া নেই। নির্মম। আবার সেই বিদেশী কেতায় সাজানো ঘর, সেই বিধর্মী স্বামী! দশম চন্দ্রের বোধ হয় শেষ সেদিন। জীর্ণ পাতা গাছ থেকে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল, বাঁশগাছগুলি কাঁপছিলো প্রদোষের হাওয়ায়। উঠোনে খানিকটা পায়চারি করলাম, যে জায়গাগুলি ভাল লাগে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্মৃতির কোঠায় তাদের সৌন্দর্য রাখবো জিইয়ে। পদ্মদিঘীর পারে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃদু হাওয়ায় মরা পদ্মের কুঁড়ি আর পাতা খসে খসে পড়ছে। জুনিপার গাছটার তলায় বসে পড়লাম। ঘণ্টা-খানেক কেটে গেল। তিনশো বছর ধরে এই গাছটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বংশের কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো। বাঁশ ঝাড থেকে একটা ডাল ভেঙে নিলাম। তারপর এক থোকা জাম। লাল জাম সবুজ পাতার আড়ালে লুকানো। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরলাম। এবার ওয়াঙা ডা-মা এসে ডেকে নিয়ে গেল। যাবার সময় হয়েছে। ক্রীসান্থিমামের কয়েকটা টব নিয়ে রিক্সায় উঠলাম। ক্রিসান্থি-মামের পরম মুহূর্ত এসে গেছে। তাদের সোনালি আর লাল সমারোহে আমাদের বাড়ির শূন্যতা ছেয়ে গেছে। ভালো লাগে! দেখে ভারি ভালো লাগে।

বাড়ি ফিরে দেখি, উনি নেই। ঝিকে শুধোতে বললে, কি একটা জরুরী কাজে খুব ভোরই বেরিয়ে গেছেন। ক্রীসান্থিমামগুলো ওঁর শোবরে ঘরে সাজিয়ে রাখলাম, ওঁকে অবাক করে দেব। কিন্তু কেমন

যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওরা। এ ফুল কি আর বিদেশী কেতায় সাজানো বাড়িতে মানায়! আমাদের আঙিনায় ওদের যে সৌন্দর্য আর সমারোহ ছিল, এখানে তো তা নেই। সেখানে ওরা ছিল আলো-আঁধারি পথের ধারে ধারে। এখানে ম্যাবমেরে হলদে দেয়ালে বন্দী হয়ে ওদের যেন নকল বলে মনে হয়। যেন কাগজের ফুল ওরা।

আমিও যেন ঠিক ঐ ক্রীসান্থিমাম ফুলের মতই। সাটীনের সাজে, গালে রঙ মেখে, চুলে মুক্তোর মালা গুঁজে আমাকে কি আর এই বিদেশী পরিবেশে মানায়! লা-মের কাছ থেকে তো রূপ-চর্চার অন্ধিসন্ধিগুলো শিখে নিয়েছি। গালে দিইনি রং, শুধু ঠোঁটে একটু ছোঁয়ালাম, হাতে মাখলাম সুগন্ধি। গোলাপের বাস ভুরভুর করে ভরে দিল ঘর। স্বামীর জন্যে তো চেষ্টার কসুর করিনি। আরসীতেও তো দেখলাম চেয়ে। হাঁ, আমি সুন্দর-ভারি সুন্দর!

সেজেগুজে বসে রইলাম তাঁর প্রতীক্ষায়। তাঁর পায়ের শব্দ শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। আহা, যদি সাটিনের লাল পর্দা সরিয়ে মৃদু আলোয় গিয়ে তাঁর সামনে এই বেশে দাঁড়াতে পারতাম, তাহলে বোধহয় বিজয়ী হতাম। কিন্তু এতো আর পুরানো বাড়ি নয়, এযে পশ্চিমি কেতায় সাজানো ফ্লাট। আমাকে যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বসবার ঘরে যেতে হবে। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠবে সিঁড়ি, স্বপ্ন ভেঙে যাবে, গুঁড়িয়ে যাবে। তারপর সেই নগ্ন আলো। আমার সৌন্দর্যকে সে তো বাড়াবে না, বরং ম্লান করে দেবে। আমি তো ঐ ক্রীসান্থিমাম—শুধু সুন্দর—আর কিছু নই। না, না, এ বাড়ির পরিবেশে নকল, একেবারে নকল আমি!

আমার স্বামী?

হাঁ—স্বামী অনেক রাতে ফিরলেন। ক্লান্তিতে তখন গা এলিয়ে

ফিরেছি ! কুশল প্রশ্ন করেই উনি চাকরকে খাবার আনতে হুকুম দিলেন। সারাদিন খেটেছেন, পেটে বুঝি একটি দানাও পড়ে নি।

খাবার টেবিলে একটি কথাও বলি নি, উনিও না। কোনো রকমে চোখের জল চেপে রাখলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ব'ললেন, "বসবার ঘরে এস।"

বসবার ঘরে এসে তিনি বাবা মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম আমার কথা শুনছেন না। চুপ করে গেলাম। অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি ব'ললেন।

"কিছু মনে কোরো না। তুমি ফিরে এসেছ, খুব খুশিই হয়েছি। কিন্তু দু'দণ্ড কথা কইবার শক্তি নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, কুসংস্কার আর অজ্ঞতা সমাজের কি অপরিমেয় ক্ষতিই করেছে। আজ হলো তাহাদের সঙ্গে লড়াই, কিন্তু জিততে তো পারলাম না। শুধু সে কথাই মনে পড়ছে। আর ভাবছি, যথাসাধ্য কি চেষ্টা করেছিলাম ? ওরা কি আর ভাবেনি. আমি তেমন চেষ্টা করিনি। কিন্তু সত্যি বলছি— চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হেরেও গেছি !

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "তুমি ওপাড়ার ইউ-দের চেন-তো ? ঐ যে দুন্দুভি তোরণের কাছে যাদের বাড়ি ? তাদেরই মেজবৌ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিছলো— শাশুড়ীর অত্যাচারেই হবে। হয়তো তার কথা আর সহ্য করতে পারেনি বেচারী। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। বাঁচাতে পারতাম, তখনই ধরা পড়েছে কিনা। ওষুধগুলো ঠিক করছি, এমন সময় বাড়ির কর্তা— যিনি মদের ব্যবসা করেন, তিনি এলেন, এসেই বললেন, তাঁর বাড়িতে তিনি বিদেশী ওষুধ ঢুকতে দেবেন না, দিশী ব্যবস্থা করবেন। পুরুত ডেকে নিয়ে আসা হলো, তারপর সুরু হলো ঘটা বাজিয়ে মেজবৌয়ের আত্মাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা। সবাই ধরাধরি করে তাকে বসিয়ে

নাকে-মুখে তুলো গুঁজে দিলে। বা! আত্মাকে ফিরিয়ে আনবার কি সুব্যবস্থা!"

বললাম, "ঐতো রীতি। কয়েকটি আত্মা বেরিয়ে গেলে, আর-গুলোকে ধরে রাখবার জন্য অমনি করে তুলো গুঁজেইতো দিতে হয়।"

আলোর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব'ললেন, "তুমি, তুমিও এ কথা বল?

অপ্রতিভ হলাম। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌটি কি মারা গেছে।"

তিনি রেগে গেছেন, ঘরময় পায়চারি করছিলেন। এবার আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছেন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। কি তাঁর চাউনি।

"মারা গেছে! তোমাকে যদি এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাখা হয়, তুমি বাঁচবে?" আমার হাত দু'খানা নিজের মুঠোয় শক্ত করে ধরে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখে চেপে ধরলেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল! নখ দিয়ে রুমালখানা ছিঁড়ে হাঁপাতে লাগলাম। উনি হাসলেন—কুকুর যেমন করে ডাকে—তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র সে হাসি। তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। চন্দ্রমল্লী যেন আরও ম্লান হয়ে গেছে।

রাতে সাটীনের পোষাক ভাঁজ করে রেখে দিলাম। দুল খুলে রাখলাম রুপোর কৌটায়। এতদিন যা' শিখেছি ভুল, ভুল! ফুলের মত, আফিমের নেশার মত ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যে ওঁর মন পাওয়া যাবে না। ওঁর উপযুক্ত হতে হবে। মা না দেয়ালের দিকে মুখ করে ক্লান্ত স্বরে বলেছিলেন,

"সময় বদলে গেছে!"

সবই ত হলো। পা খুলতে বড় লজ্জা হত। অবশেষে স্বামীর বান্ধবী শ্রীমতী লিউ-ই আমাকে উদ্ধার করলেন। বান্ধবী? তা বোন, স্বামী তো তাই বলেন। শুনেছি, তিনি একটি নতুন বিদেশী স্কুলে পড়ান। তিনি খবর দিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

তিনি যেদিন প্রথম এলেন, বাড়িতে ঘটা পড়ে গেল। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম অতিথি তিনি! ঝিকে বলে বাজার থেকে ছ'রকম কেক, তরমুজের বীচি, ভালো চা আনিয়ে রাখলাম—সেই যে 'দুর্দিনের বন্ধু' মার্কা ভাল চ, পরলাম আপেল-রঙা সাটীনের পোশাক, কানে মুক্তোর দুল। বাড়িটা এত ছোট! ভাবলাম তিনি বিশ্রী না মনে করেন। আর স্বামীর ঘরটা হ'য়ে আছে বই খাতার জঙ্গল! চেয়ার-টেবিলগুলো একটু ঠিক করে রাখবো ভাবলাম। সম্রান্ত অতিথির বসবার যোগ্য আসন চাই তো। উনি বেরিয়ে গেলেই সব গোছ-গাছ করে রাখবো। কিন্তু বেরোবার নামটিও নেই। সেই সকাল থেকে ঘর নিয়েছেন। খালি বসে বসে বই পড়ছেন। কি আর করি, থাকুন না উনি, একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি ভেবে যেমনি ঢুকেছি, অমনি ঘণ্টা বাজলো। স্বামী দৌড়ে গেলেন। আর কি গোছাবার সময় আছে! এখন তো নিজের হাত মোচড়াতে ইচ্ছে করছে। একটু আগে হলেই হতো। ওঁদের কথা শুনতে পেলাম। পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেখছিলাম। কী অদ্ভুত! উনি শ্রীমতী লিউ-ইর হাত ধরে নাড়ছেন। ওঁর মুখ হাসিতে ভরে গেছে। ওঃ, আমার কাছে যখন থাকেন, মুখ অমন গোমড়া করে থাকেন কেন? বৌকে বুঝি মনে ধরে না। কিন্তু বান্ধবীকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন।

বোন, তুমি সেখানে থাকলে শিখিয়ে দিতে পারতে কি করতে হয়। কিন্তু আমি তো তখন একা। বন্ধু-বান্ধব নেই। শুধু ভাবছিলাম,

কি করি? কি করে স্বামীর অতিথিকে অভ্যর্থনা করি, স্বামীকে খুশি করি।

মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে, ঈর্ষাও বলতে পার বোন, লিউ-ই কে দেখলাম। কি এমন অপরূপ সুন্দরী! মুখখানা তো মস্ত। চোখে মায়া আছে, হাসিতে ঝলে উঠেছে। কিন্তু পুঁতির মতো চোখ, মেয়েলি ভাব নেই। পরনে মোটা সিল্কের ঘাঘরা, তার ওপর ধূসর রঙের ছোট্ট কোর্তা। পা দু'খানি মর্দদের মতো, জুতোও পরেছে তেমনি। আর বেহায়া মেয়েদের মত খিল খিল করে হাসে!

বসে বসে স্বামীর সঙ্গে কত গল্প করলেন। তড় বড় করে কত কথা বললেন। কি তার হাসি, কেমন যেন উষ্ণতা আছে, আছে প্রাণের প্রাচুর্য। আর আমি তার কি ছাই বুঝবো! শুধু স্বামীর মুখের পানে চেয়েছিলাম। ইস্! খুশি যেন উছলে পড়ছে!

সে রাতে খাওয়ার পর স্বামীর পাশে চুপ করে বসেছিলাম, শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে কথা বলার সময়ে ওঁর মুখখানা কেমন হয়ে গেছল, সে-কথা ভুলতে পারছিলাম না। মুখের অমন চেহারা তো কখনো দেখিনি। কেমন ব্যগ্র দৃষ্টি। মনে হচ্ছিল শ্রীমতী লিউ-ই যেন পুরুষ। পুরুষ বন্ধুর সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন। ওর জন্যে স্বামীর যেন ছিল অফুরন্ত কথা—তিনি তা ঢেলে দিলেন। এখন তো কথাটি নেই। ওঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, উনি কি করেন?

"উনি?" স্বামী বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "উনি মেয়েদের বিখ্যাত কলেজ ভাসার থেকে পাস করেছেন। মেয়েদের যা হওয়া উচিত, উনি ঠিক তাই। শুধু বিদ্যাই নয়, শিশুপালন, গৃহস্থালিতেও উনি পটু। ওঁর তিনটি ছেলে মেয়ে, দেখলে চোখ জুড়োয়!"

সেই মুহূর্তে লিউ-ইর প্রতি মন ঘৃণায় ভরে গেল। আর উনিই বা কি? সৌন্দর্যের কোনো দাম নেই, শুধু বিদ্যা আর বিদ্যা। হাঁ, আমি লিউ-ইকে কৃপা করি।—ঘৃণা করি! কি করবো গো বল? ওঁর মন কাড়বার তো ঐ এক উপায়? মেয়েটা তো একটুও ভালো দেখতে নয় গো।

কি জানি কেন বললাম, "উনি কি সুন্দরী?"

"মানে", হেসে বললেন, "মোমের পুতুলটি নন, বল। কিন্তু দেখেছ ওঁর স্বাস্থ্য-সামর্থ্য, ওঁর মুখের বুদ্ধির দীপ্তি—তাই তো ওঁর সৌন্দর্য!"

রাগে দুঃখে পাগল হয়ে গেলাম। পারব না, অমন স্বামীর মন যোগাতে! আবার মার কথা মনে পড়লো: "স্বামীর মন যোগানই তোমার কর্তব্য।"

স্বামী কি যেন ভাবছিলেন। কি জানি কি ভাবছিলেন। কিন্তু এতো বুঝলাম। এই যে রঙ-বেরঙের সাটীনের পোষাক পরেছি, এই যে দুল দুলিয়েছি কানে, চুল আঁচড়েছি পরিপাটি করে, বেণী বেঁধেছি, স্বামীর এত কাছে বসে আছি যে হাত নাড়লেই ওঁর হাতে ঠেকে যায়, তবু তো তিনি আমার কথা ভাবছেন না। মাথা নিচু করে রইলাম। ওঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম। আমার অতীত ডুবে যাক, যাক, আমি স্বামী সোহাগিনী হব। হব, হব, হব! হঠাৎ বললাম, আমি পা খুলতে চাই।

স্বামী একটু আশ্চর্য হলেন।

তা আশ্চর্য হন না! আমাকে আধুনিক হতে হবে, স্বামীর মনের মত হতে হবে।

[সাত]

অতীতের পানে যখন তাকাই, এই দিনটিকে আমার শুভদিন বলে মনে হয়। এই দিনটি থেকেই আমার বিবাহিত জীবনের মোড় ঘুরলো। স্বামী আমার কথা না ভাবুন, অন্তত সদয় তো হলেন। তাইত সেদিনের সন্ধ্যাটি আছে আমার মনের পটে অমর হয়ে।

আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তখন না ছিল আমাদের চিন্তাধারায়, না ছিল আমাদের রীতিনীতিতে ঐক্য। যখনই কথা বলতে হত, লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতাম। কথা বলবারই বা কি ছিল! স্বামীও যেন কোনো অচেনা লোককে বলছেন, এমনি করে কথা কইতেন। উনি আমাকে বুঝতেন না, অবাক হয়ে বুঝি বা দেখতেন। কিন্তু মুখের দিকেও একবার তাকাতেন না। এবার থেকে কিন্তু সে-বাধা রইলো না। তিনি আমাকে এবার চিনলেন, স্বামী আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে যখন আমার প্রয়োজন আছে, তিনি কি আমার ডাক না শুনে পারেন! তিনি আমাকে এবার দেখতে পেলেন, এতদিন তো দেখেনই নি। আমার ভীরু প্রেম এত দিন শুধু ভয়ে কেঁপেই মরছিলো। সে পেল পরিপূর্ণতা। শ্রদ্ধা এল। কখনো তো স্বপ্নেও ভাবিনি, এতখানি প্রেম থাকে পুরুষের। এত কোমল তারা হতে পারেন!

পা খোলবার কথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভেবেছিলাম দু'একটা ডাক্তারী পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হবেন। অবাক কাণ্ড! দেখি, নিজে একটা গামলায় করে গরম জল আর সাদা কাপড়ের পট্টি নিয়ে এলেন! ওমা! শুধু দেখা নয়, ছোঁবেন নাকি পা! কি লজ্জা

চীনা মেয়ের পা তো পুরুষে দেখেই না, তা আবার ছুঁতে এসেছেন! কি করবো? যখন হাঁটু গেড়ে বসলেন, ক্ষীণ আপত্তি তুললাম। সারা দেহে জ্বলছিল আগুন। বললাম, আমি নিজে করে নেবখন।

হেসে বললেন, "এখন তো স্বামী নই, ডাক্তার। লক্ষ্মী মেয়েরা ডাক্তারকে বাধা দেয় না।"

তবুও রাজি হতে পারলেম না। তিনি আমার চোখের দিকে তাকালেন।

গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিউই-লান, জানি, তোমার সংস্কার তোমাকে বাধা দেবে। কিন্তু তারাই তো মানুষ যারা সংস্কারকে জয় করতে পারে। আমাকে দেখতে দাও, আমি তোমার স্বামী।"

আর আমার মুখে কথাটি সরলো না। পা দুখানা ওর হাতে ছেড়ে দিলাম।

পা দু'খানা কোলের উপর টেনে নিয়ে জুতো-মোজা খুলে ফেললেন। তারই নিচে কাপড় দিয়ে জড়ানো পা। তাও খোলা হলো।

"কি কষ্টই পেয়েছো!" মৃদুস্বরে বললেন, "বেচারী, বেচারী! কিন্তু কেন এই সংস্কারের পুজো, আমায় বলবে কি?

চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। পুরাতন সংস্কার ভেঙে তিনি নতুন সংস্কারে আমাকে জড়াতে চাইছেন। আমার পুরানো সব কিছু তো ব্যর্থ হয়ে গেল, নতুনের দাবী এসেছে। তিনি করছেন সে দাবী। কিন্তু ভয় হয়, কি জানি কি হবে!

অসহ্য বেদনা! পা বাঁধাও কষ্ট, খোলায়ও তেমনি। কিন্তু ক'দিনেই যেন মনে হলো সঙ্কুচিত পা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছে; রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে।

পুরানো সংস্কার তো আর একদিনে উড়িয়ে দেয়া চলে না! দিনে কতবার ইচ্ছে হোত, পট্টি খুলে ফেলি, আবার শক্ত করে পা বাঁধি।

তাতে আরাম তো পাবো। আবার স্বামীর কথা মনে হোত। তিনি কি বলবেন? রাতে তো তিনি দেখতে পাবেনই। পট্টি খুলে ফেলে আবার জড়াতে বসে যেতাম। কিন্তু জ্বলুনি কি থামে? পা ছড়িয়ে বসে বসে কাটত দিন।

স্বামীর কাছে এই চেহারা নিয়ে কি করে দাঁড়াব—একথা আর মনে আসত না। আরসীতেও মুখ দেখিনি। স্বামী তো আমাকে ভালবাসেন, আবার কি চাই! রাতে যখন অসহ্য ব্যথা হত, বালিশে মুখ ঘসে কাঁদতাম। চোখ ফুলে উঠতো, স্বর ভেঙে ভেঙে যেত—ব্যথা আর সহ্য করতে পারতাম না। স্বামী মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। আদর করে কত কথা কইতেন, গল্প বলতেন। বোন, আমার সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি, আমার দুঃখ তাঁকে কাঁদালো। কখনো কখনো ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতাম। তিনি স্বামী—সেকথা ভুলে যেতাম, মনে হোত, আমার ব্যথার ব্যথী—আমার বন্ধু তিনি। অশ্রুনিরুদ্ধ স্বরে তিনি বলতেন, "কেঁদো না কিউ-ই-লান। মনে কর, আমরা যুগার্জিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমাদের জিততে হবে।" তোমার ব্যথা তো আমারও ব্যথা। কিন্তু জেতাও তো চাই।

"না," ফুপিয়ে বলতাম, "সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ নয়। আমি করছি আপনারই জন্য। আমাকে যে আপনার জন্যে আধুনিক হতে হবে।

ছিঃ, কি করে এ-কথা বলেছিলাম!

উনি হাসতেন। একটু বা ঝলমল করে উঠত তাঁর মুখখানা। ঠিক অমন হাসিটিই দেখেছিলাম, শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে যে-দিন গল্প করছিলেন। এতো ব্যথায় ওইটুকুইতো আমার সান্ত্বনা! পরে তো এত কষ্ট হয়নি।

পা দু'খানি যেন নতুন করে পেলাম। এ এক নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা, মন খুশিতে ভরে গেল। বয়েস আমার তরুণ, পাও আমার সবল সুস্থ। এখন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি। বয়েস বেশি হয়ে গেলে এমনি পা খুলতে গেলে বিপত্তিই হোত, পার তখন আর কিছুই তো থাকে না, কিন্তু আমার অল্প বয়েস বলে অত ক্ষতি হয়নি, শুধু অবশ হয়ে গিছলো, কয়েক দিনেই ঠিক হয়ে গেল। আজকাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও তেমন কষ্ট হয় না। একদিন তো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। স্বামী অবাক হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে বললেন,

দৌড়ে এলে! তাহলে সেরে গেছ দেখছি। আর কষ্ট করতে হবে না।

—"কিন্তু শ্রীমতী লিউ-ইর মত এখনো হয় নি।"

—"সে কখনো হবে না। বাড়বার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে কিনা। ওঁর পা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে। অতো বড় আর হবে না।

দুঃখ হলো। যাক্, কি আর হবে! লিউ-ইর মতো অত বড় পা তাহলে আমার ভাগ্যে নেই, কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকব নাকি। একটা উপায় বার করলাম। আমার জরীর জুতো তো এখন বাতিল হয়ে গেছে। ঝিকে নিয়ে গিয়ে—শ্রীমতী লিউ-ইর মতো জুতো কিনে নিয়ে এলাম! দু'ইঞ্চি লম্বা জুতোজোড়া, কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে আমার পা ছোট। কাজ করা জুতো তো এখন বাতিল। কিন্তু লম্বা জুতো গোড়ালির দিকটায় তুলো গুজতে হলো।

শ্রীমতী লিউ-ইকে এবার দেখাবার ভারি ইচ্ছে হোলো। জুতো পরলে এখন তো আর বোঝা যাবে না যে আমার পা ছোট। ঠিক শ্রীমতির মতোই আমার পা।

এবার স্বামীকে ধরলাম, শ্রীমতী লিউ-ইর ওখানে বেড়াতে যাব।

স্বামী বললেন, "কালই চল।"

ওমা, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন! এ:তো রীতি নয়! কি আর করি, ওঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা! ওঁর তো ওসবের বালাই নেই।

পরদিন লিউ-ইর বাড়িতে স্বামী আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। তবে একটু অবাক হলাম বোন, যখন শ্রীমতী লিউ-ইর ঘরে আমায় আগে ঢুকতে বলে নিজে পেছনে পেছনে গেলেন। এর মানে তখন বুঝতে পারি নি। কেমন খট্‌কা লাগছিল।

বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, উনি বুঝিয়ে বললেন, এহচ্ছে পশ্চিমের আদব-কায়দা।

আমি শুধালেম, কেন? ওখানে পুরুষরা মেয়েদের থেকে সব বিষয়ে ছোট বলেই বুঝি আগে ঢোকার নিয়ম? তাইতো শুনেছি।

"না, না, তা নয়"—স্বামী উত্তর দিলেন।

তিনি এবার বুঝিয়ে দিলেন। এমনি আদব-কায়দা ওদের দেশে পুরানো দিন থেকে চলে আসছে। মেয়েদের সেখানে খুব মান। আমার কাছে ভারি অবাক লাগলো। আমাদের দেশের বাইরে আবার ভদ্রতা, সভ্যতা—এসব আছে নাকি! স্বামী বললেন, তাদেরও ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। তিনি আমাকে সে-সব পড়ে শোনাবেন। অবাক কাণ্ড! তাহলে ওরা একেবারে অসভ্য নয়!

বিছানায় রাতে শুতে গিয়ে ভালই লাগলো, আরো আধুনিক হবো। খানিকটা তো হয়েছিই। পুরুষের মত জুতো পরেছি; বেরোবার সময় মুখে আর রং মাখি না, চুলেও মুক্তো গুঁজি না। আমার তো মনে হয় স্বামীও তা টের পেয়েছেন। তবে মুখে ভাব দেখান, কিছুই যেন জানেন না।

আমি আধুনিকা, শ্রীমতী লিউ-ইর মত বিদ্যে না থাকলেও আধু-

নিকা তো বটেই! এখন তো আমাকে প্রায় ওরই মতো দেখায়। আমার স্বামীও নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন।

জীবনের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হলো। পরিবর্তন চাইলাম বলেই সে এল, আমাকে অভিভূত করে দিল। সন্ধ্যেবেলা স্বামীর কাছে দেশ-বিদেশের ইতিহাস শুনে কাটতো। কি বিদ্‌ঘুটে নাম, আব মজাব মজার ঘটনা। তিনি সব জানেন দেখছি। স্বামীকে তো একদিনই বলেই ফেললাম, "যেমন নাম, তেমনি যত কাণ্ড। হাসতে হাসতে ফিক্ ধরে।

"আমরাও," স্বামী উত্তর দিলেন, "ওদের কাছে সমান হাস্যকর।"

"আমরাও!" অবাক হয়ে গেলাম। "আমাদেরও অমনি অদ্ভুত ওরা মনে করে?"

হাঁ, করে বইকি। স্বামী হাসলেন, তাদের কথা একবার কান পেতে শুনো! তাদের লেখা বই পড়ে দেখো। আমাদের পোশাক, মুখোসেব মত ভাবলেশহীন মুখ, আমাদের খাবাব –এসব নিয়ে কত ঠাট্টাই ওরা করে। তারা ভাবতেই পাবে না যে, আমরা সংস্কারমুক্ত হতে পারি, আমরাও মানুষ।

শুনে আশ্চয হলাম। এমন বিদ্‌ঘুটে চেহারা আর পোষাক নিয়ে ওবা আমাদের সমান হতে চায়? উত্তর দিলাম, আমরা তো বহুদিন থেকে এই পোষাক পরে আসছি। এইসব নিয়ম-কানুন মানছি। আমাদের কালো চুল আর চোখ তো আমাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ·…

ঠিক, ঠিক! আমাদের যেমন, ওদেরও তেমনি।' স্বামী বললো।

উত্তেজিত হয়ে বললাম, "ওরা তো সভ্য হতেই আমাদের দেশে

ছুটে আসে, আমাদের আবার বলে অসভ্য!' আমার মা তো এই এই কথাই বলেন।

"কার কাছে শুনেছ এ কথা?"—উনি হাসলেন!

"মার কাছে।"—মৃদুস্বরে বললাম।

"তোমার মা ভুল বুঝেছেন। বরং ওরা তো বলে সভ্যতা শেখাতেই ওরা দলে দলে আসে এ দেশে। কিন্তু দু'পক্ষই ভুল করে। তারা জানে না, সভ্যতা কোনো জাতির নয়, সভ্যতা পৃথিবীর। প্রতি জাতিকে প্রতি জাতির কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়।"

বিদেশীদের কথা, তাদের আবিষ্কারের কথা শুনতে খুব ভালো লাগতো। স্বামীর' কাছে শুনতাম, শুনতে শুনতে ক্লান্তি আসতো না। ওরা নাকি জলের কল আবিষ্কার করছে, হাতল টিপলেই নল দিয়ে জল পড়ে। জ্বালানি কাঠ লাগে না, এমনি উনুন, উড়োজাহাজ, ডুবুরি জাহাজ, আরো কত মজার জিনিস তৈরি করেছে।

স্বামীকে একদিন ওদের আবিষ্কার প্রসঙ্গে বললাম, এসব তো ভেল্‌কি! মার কাছে রূপকথা শুনতাম, পরীরা জল, আগুন, মাটি নিয়ে কতো আশ্চর্য খেলা দেখায়!

"এ বিজ্ঞান," স্বামী হাসলেন, "ভেল্‌কি নয়। শুনে তোমারও মনে হবে কত সোজা এসব।'

আবার সেই বিজ্ঞান! তাহলে দাদারই মত উনিও বিজ্ঞান-পাগল! দাদা এই বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে কোথায় দূর আমেরিকায় গিয়ে পড়ে আছে! বিদেশে ওদের ছাইপাশ খাবার খাচ্ছে, নলের জলে চুমুক দিচ্ছে, ওসব কি সহ্য হয়? জন্ম থেকে যে অভ্যেস-তা এখন চুলোয় গেল! দেখতে হবে তো বিজ্ঞান কি জিনিস!

কিন্তু স্বামীকে বলতেই তিনি হেসে খুন। তিনি ক্ষেপাতে

লাগলেন, সত্যি, কি ছেলেমানুষ তুমি। বিজ্ঞান তো এমনি জিনিষ নয় যে হাত দিয়ে খেলনার মতো নাড়াচাড়া করে দেখবে।

তারপরে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি দেখে তিনি বইয়ের তাক থেকে কতগুলো বই বার করলেন। তারপর বোঝাতে লাগলেন।

এখন তো রোজই বিজ্ঞানের কথা শুনছি। দাদা কেন যে মার অবাধ্য হয়ে চার সাগরের পারে চলে গেল এখন কতকটা বুঝতে পারি। শুনতে শুনতে আমিই তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাই। মস্ত পণ্ডিত হয়েছি! কিন্তু কাকে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিই—বলতো? একদিন রাঁধুনীকে ডেকেই বললাম,

"জানো, পৃথিবীটা গোল। আমাদের দেশটা পৃথিবীর মাঝখানেও নয়, এমনি হাজার হাজার দেশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।"

সে তো পাগলই ভাবলো! চাল ধুচ্ছিল ধুচুনিতে, ধোয়া রেখে ফ্যালফ্যাল করে খানিকটা চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে, "কে বলেছে?"

ওঁর নাম করলাম। 'কর্তা বলেছেন, এবার বিশ্বাস হলো তো?'

চুপ করে গেল। তবু সন্দেহ যায় না। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললে, কর্তা তো খুব পণ্ডিত লোক। অনেক জানেন কিন্তু চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায় পৃথিবীটা গোল নয়। কি জানি, প্যাগোডায় উঠে দেখেছি হাজার মাইল ধরে মাঠ, পাহাড় আর নদী বিছিয়ে আছে। গোল বলে তো কখনো মনে হয় নি। আর আমাদের দেশটাই তো মাঝখানে, শাস্ত্রবাক্যি তো আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একে তো মাঝখানের রাজ্যি বলে।

হেসে বললাম, "আমার তো এই ধারণাই ছিল, কিন্তু উনি কত বই পড়েন, উনিই বলেছেন, পৃথিবী এত বড় যে আমাদের যখন সূর্য ওঠে, চার সাগরের পারে তখন নিশুতি রাত। চার সাগর পারে

যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায় কিনা। আবার এখানে যখন ঘুরঘুট্টি আঁধার, ওখানে তখন সূর্য আলো দেয়।

রাঁধুনি চেঁচিয়ে উঠলো, কি জানি মা কি সব কথা! কিন্তু তুমি মা বুঝি ভুল বুঝেছ। ভিন্ দেশে যেতে যদি মাসের পর মাস কেটে যায়, তাহলে সূর্য কি করে একঘণ্টা-আধঘণ্টায় ওখানে চলে যায় বল! ও তো উদয়-গিরি থেকে অস্তগিরিতে যেতেই সারাদিন কাটিয়ে দেয়। তা সাগর পাড়ে কি করে অত তাড়াতাড়ি পাড়ি দেবে গা?

সে এবার চাল ধোয়া শুরু করলো।

তা বোন, ওর আর দোষ কি? আমি তো ওর মতই মূর্খ ছিলাম। ভাবতাম, সৃষ্টিকর্তা পান-কু আমাদের জন্যই চাঁদ সূর্য, তারা, এসব সৃষ্টি করেছেন। স্বামীর কাছে প্রথম শুনলাম, ওরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদের নয়। বিশ্বাস করবো না কেন বোন, উনি তো মিথ্যে কথা বলেন না। উনি যে সব জানেন।

[আট]

কি করে স্বামীর সোহাগ পেলাম, জিজ্ঞেস করছ বোন? কথায় তো তা বলতে পারবনা। তবে বুঝতে পেরেছি। যখন বুকে দোলা লাগলো, কি করে তা বুঝলাম?

ওমা তাও বুঝতে পারছ না।

হিম-শীতল পৃথিবী কেমন করে সূর্যের উষ্ণতা উপলব্ধি করে, সমুদ্র কেমন করে জানে চন্দ্রের আকর্ষণের কথা?

দিনগুলো যেন প্রজাপতির মত রঙীন ডানা মেলে দিল। কি করে যে কেটে গেল দিন টেরও পেলাম না। পিতৃ-পুরুষের গৃহের কথা ভুলে গেলাম। নিঃসঙ্গ লাগবে কেন বোন, স্বামীর সঙ্গ পেলাম যে। তাঁর সঙ্গই তো আমার সব। তিনি যেখানে থাকবেন সেই তো আমার ঘর।

স্বামী রোগী দেখতে চলে গেলে বসে বসে তাঁর কথাগুলো ভাবতাম, বইয়ের পাতা ওলটাবার সময় তাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম। তাঁর চোখ, তাঁর মুখ, ঠোঁটের ভঙ্গী, হাতের স্পর্শ সব যেন ছিল আমার সঙ্গী। রাতে বাড়ি ফিরে যখন বই পড়ে শোনাতেন, চুরি করে কত দিন ওঁর মুখের পানে তাকিয়েছি। আমার বুক ভরে গেছে।

দিন-রাত তাঁর কথাই ভাবতাম। বর্ষার নদী যেমন শীতের জীর্ণ পয়ঃনালাকে উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়, রিক্ত প্রান্তরে ফসলের সম্ভাবনা আনে, আনে প্রাণের প্রাচুর্য আর সার্থকতা—তেমনি করে আমার স্বামী তাঁর গভীর ভালোবাসায় আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করলেন।

আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতা আর প্রয়োজন ভরাট হয়ে গেল। খাদ তো রইল না।

পুরুষ আর কুমারীর অন্তরের এই শক্তির কথা কে বুঝবে? হঠাৎ চোখে চোখে মিলনে তার শুরু। লাজুক, দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টি, তারপর সে তো জ্বলে উঠলো সবখানি আলো নিয়ে। দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টি চিরস্থায়ী হলো। প্রথমে আঙুলের স্পর্শ, আঙুলে মিললো আঙুল। কিন্তু সে তো শুরু। এবার হৃদয় ছুটলো হৃদয়ের সঙ্গমে।

তোমাকে বলতে ভারি লজ্জা করছে কেন। আমার সফলতা এসেছে। এখন তো শুধু গোপন কথা, লজ্জাভরা ফিসফিসানি।

বোন, সে আনন্দ কি করে তোমার কাছে প্রকাশ করবো। সে যে মনের রঙে ছোপানো রূপকথা—ভাষার নয়, অনুভূতির! একাদশ চন্দ্রের শেষ দিনে আমার গর্ভে এসেছে সন্তান, ওঁর সন্তান! যখন ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটার সময় হবে, বছর আসবে ঘুরে—তখন আমার সন্তান জন্ম নেবে।

স্বামীকে জানালাম, পত্নীর কর্তব্য করেছি। আমার গর্ভে তাঁর সন্তান জন্ম নিয়েছে। তিনি ভারি খুশি হলেন। স্বামী তাঁর নিজের বাড়িতে খবর পাঠালেন। তাঁরা জানালেন অভিনন্দন। মার কাছে কোনো খবর পাঠাই নি। নূতন বছরের গোড়ায় তাঁর কাছে যখন যাব, তখন বলবো। শুনে খুব খুশি হবেন নিশ্চয়ই!

স্বামী আর আমি সন্তানের গল্পে মসগুল হয়ে রইলাম। কিন্তু সে তো ক'দিনের জন্যে। এবার এল নানা ভাবনা। আগেই বলিনি, আমার

ভারি মুশকিল হলো। সবার কাছ থেকেই ঝুড়িঝুড়ি উপদেশ এল। শাশুড়ী-ঠাকরুণের উপদেশ এর মধ্যে সবচেয়ে দামি।

কি মুশকিলই হলো! এতদিন স্বামীর পরিবারের একটা কাক-পাখীও ডেকে জিজ্ঞেস করে নি। দু'তুবার নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখেছি, শাশুড়ী-ঠাকরুণ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন নি। আমি তখন বাড়ির এক ছেলের বৌ মাত্র। তাও বাড়ি থেকে চলে গেছি। পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এবার কিন্তু দেখতে দেখতে পরিবারের একটা কেউকেটা হয়ে উঠলাম। স্বামীর ভাইদের কারো ছেলেপুলে নেই। আমি যখন পরিবারের বংশধরকে গর্ভে ধরে আছি, যদি ছেলে হয়, আমার ছেলেই হবে বিষয়ের উত্তরাধিকারী, বংশে বাতি দেবে—তাই না এত ঘটা করে আদর! কিন্তু ছেলে হলে কি আর বেশি দিন আমার কাছে রাখতে পারবো? সে তো আমার একার নয়, সমস্ত বংশের। হেমা দেবী কিউ-ই-ইন, আমার সন্তানকে তুমিই রক্ষা কোরো!

ঠিক এমনি সময় শাশুড়ী-ঠাকরুণ একদিন ডেকে পাঠালেন। আগে যখন গেছি, অতিথিদের ঘরে বসেছি। তিনি তখন আমাদের উপর চটে ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি তৃতীয় উঠোনে অন্দরমহলে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, চা খেতে বসেছেন। আরো মোটা হয়েছেন, কিন্তু মুখখানায় সংযত গাম্ভীর্য—এক মহিমা। পা তুখানা আবার খুবই খুদে। মনে হয় দেহের ভার বুঝি সইবে না। এখন তিনি হাঁটা চলা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন, যদি বা এক পা যান তো তুটো হৃষ্টপুষ্ট বাঁদীর কাঁধে ভর দিয়েই হাঁটেন। তারা তাঁর চেয়ারের পিছনে সর্বদাই মোতায়েন থাকে। তাঁর হাত তুখানা ছোট, আঙুলে আঙুলে সোনার আঙটি, ঝকঝকে এক করশীর নল হাতে ধরে আছেন, বাঁদীরা হরঘড়ি তামাক ভরে দিচ্ছে। এক গাদা কাগজ রয়েছে, তার

থেকে উঠছে ধোঁয়া, তারা ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে। প্রণাম করতেই হাত ধরে তুলে নিলেন। তারপর বললেন,

"দিব্যি মেয়ে, খাসা মেয়ে!"

এই কথা কটি বলতেই হাঁফিয়ে উঠেছেন। যাক্, সন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝলাম। নিজের হাতে করে চা ঢেলে দিলাম। এবার মেঝেতে বসলাম। তিনি কিন্তু আমার এই বিনয় দেখে খুশি হলেন না। হাত ধরে পাশের আসনে বসিয়ে দিলেন। আগে যখন এসেছি, কোথায় বসি না বসি—খেয়ালই করেন নি। এখন তো আর সেদিন নেই। আমাকে পাশে বসিয়ে তারপর অন্যান্য বৌদের ডেকে পাঠালেন। তারা তো আমার আদর দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছিল। তারা বন্ধ্যা, আদর তো তাদের জোটে নি, লাথি-ঝাঁটাই প্রাপ্য। বড়টি তো আমার সৌভাগ্য দেখে কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলো। শুনলাম, তার স্বামী নাকি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে! বেচারী! স্বামীকে হয় তো সত্যিই ভালবাসে!

শাশুড়ী-ঠাকরুণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বড় বৌ তখনো কাঁদছে। এবার শাশুড়ি তামাকে টান দিতে দিতে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। আমার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। সে যেন কেঁদে বাধা না সৃষ্টি করে।

শাশুড়ী-ঠাকুরুণ অনেক উপদেশ দিলেন। তার মধ্যে একটা কিন্তু নেহাৎ অদ্ভুত বলেই মনে হলো। বললেন কি জান? "বৌমা, ছেলের জামা-কাপড় তৈরি করতে বসে যেওনা যেন।—তোমরা আজকালকার মেয়ে বাছা, মানো না তো কিছুই। কিন্তু আমরা বুড়ো-হাবড়া, আমাদের মানতেই হয়। ওতে সয়তানের দৃষ্টি পড়ে। য়্যান্‌ওয়েইতে আমার বাপের বাড়ি; সেখানে নিজের চোখে অমঙ্গল ঘটতে দেখেছি। দেবতারা তো নিষ্ঠুর, তাঁদের জানতে দিতে নেই সন্তান

আসছে। মানুষ পৃথিবীতে আসতে চাইলেই ওঁরা তাকে ধ্বংস করতে চান। তাই বলি বাছা, আগেই ঘটা করে জামা-কাপড় কোরো না!'

বললাম, "মা, ওকে কি তাহলে ন্যাংটোই রাখবো?"

"বাপের গায়ের জামা-কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রেখো, ছেলে দীর্ঘজীবী হবে! আমার ছ'ছটি ছেলে, তাদের বেলায়ও তাই করেছি।"

বাড়ির বাঁজা বৌয়ের দলও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়লো না: সন্তান হওয়ার পর অমুক মাছ খেয়ো ভাল থাকবে, কেউ বা বাতলালে কালো চিনির সরবৎ—এমনি কত কি পরামর্শে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। হিংসেয়ও জলে পুড়ে মরছিল, ঐ করে যদি শান্তি পায়! আহা, বেচারীরা!

সন্ধ্যেবেলা খুশি হয়েই বাড়ি ফিরলাম। শাশুড়ী সদয় হয়েছেন। ফিরে ওঁকে সব কথাই বললাম। উনি তো রেগে আগুন! রাগে মাথার চুল এলোমেলো করে ফেললেন, তারপর ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। বললেন, "যত সব কুসংস্কার, মূর্খতা! প্রতিজ্ঞা কর, এসব তুমি করবে না, করতে পারবে না। তারপর আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। 'কিউ ই-লান, প্রতিজ্ঞা কর, নইলে ভবিষ্যতে আর সন্তানের আশা তুমি কয়ো না। আমি জন্ম-শাসন করবো, আর সন্তান হবেনা আমাদের।"

কি করবো? ভয়ে ভয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম।

"কাল তোমাকে আমার" এবার শান্তস্বরে তিনি বললেন, 'অধ্যাপকের বাড়ি নিয়ে যাব। তিনি আমেরিকার মানুষ। আশা করি, তাঁদের শিশুপালন পদ্ধতি দেখে তোমার চোখ ফুটবে। অন্যভাবে

তুমি তাঁদের অনুকরণ করবে না, তাঁদের ভালটুকু তুমি গ্রহণ করবে। তোমার দৃষ্টির প্রসার হবে।

রাজি হলাম। তা বেশ, ওঁর কথা মতোই তো কাজ করতে হবে। কিন্তু গোপনে আর একটা কাজ করলাম।

খুবই ভোর তখন। দোকান-পাট ভাল করে খোলেনি। একটা দোকানের একটা বাচ্চা ছেলে সবে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলছিল। আবছা কুয়াশা তখনো চারদিক ঘিরে আছে। ধূপের দোকান থেকে কিনলাম ধূপকাঠি। তারপর মন্দিরে গেলাম।

ধূপ জ্বালিয়ে খুদে দেবতা কোয়ান-ইয়ানকে পূজা দিলাম। তিনি তো সন্তানদাত্রী, করুণার দেবী। তাঁর মর্মরের বেদীর উপর মাথা খুঁড়লাম। তখনো রাতের শিশিরে বেদী ভেজা। আমার মনের কামনা জানালাম, তারপর উঠে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম: দেবী প্রসন্ন হও, দেবী। কিন্তু তিনি তো নীরব রইলেন। ধূপদানে ছাই জমে আছে, কত সন্তানবতী আমার আগে এসে ধূপ জ্বালিয়ে পূজা দিয়ে গেছেন। আমারই মতো ছিল তাদের কামনা, আমারই মত সানুনয় দৃষ্টি। আমি ছাইয়ের গাদার ভিতরে আবার জ্বালানো ধূপকাঠি গুঁজে দিলাম। ধূপকাঠি জ্বলতে লাগলো দেবীর সুমুখে, এবার চলে এলাম।

পরদিন তাঁর বিদেশী বন্ধুর বাড়ি আমাকে নিয়ে গেলেন। ভয়ে ঘেমে উঠছিলাম বোন! কেমন একটা কৌতূহলও ছিল মনে। এখন তো হাসি পায়। বোন, তুমি যার বন্ধু, সখী—সে কিনা বিদেশী দেখে ভয় পেত!

তা কি হবে বোন, এর আগে বিদেশীর বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের চোখেও দেখি নি। বাবার কাছে মাঝে মাঝে এদের অদ্ভুত চেহারা, আচার-ব্যবহারের কথা শুনতে পেতাম। বাবা ওদের কথা নিয়ে হাসতেন। ওরা দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি ওদের ব্যবহার। তিনি জানবেন না তো কে জানবে! তিনি যে কত জায়গায় ঘোরেন। মা ওদের কথা বলতেই ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠতেন,—তিনি ওদের কথা বইয়ে পড়তেন, লোকের মুখেও শুনেছিলেন। বাড়ির ভেতরে এক দাদাই ছিল ওদের ভক্ত। সে তো পিকিঙে ওদের দেখেছে। ওর স্কুলেও নাকি ক'জন বিদেশী মাষ্টার ছিল। বিয়ের আগে শুনতাম, দাদা নাকি এদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। কি সাহস দাদার! আমাদের ছোটো শহরে তো বিদেশীর উৎপাত তখন একেবারে ছিল না। ঝি মাঝে মাঝে বাজারে দু'একটা দেখে এসে গল্প করতো। ভূতের গল্পের মতই বলতো, যন্ত্রের সাহায্যে বিদেশীরা নাকি মানুষের আত্মাকেও বাক্সে পুরে রাখতে পারে। ওয়াঙ্-ডা-মার কাছে আমি তো পুরাকালের শয়তানদের কথা শুনেছি। ওরা সেই শয়তান নাকি? শুনেছি, ওরাই নাকি দৈব দুর্ঘটনা নিয়ে আসে, আনে মৃত্যু।

স্বামীকে একথা বলায় উনি হাসলেন। অপ্রতিভ হলাম খুবই।

অবশেষে বললেন, "আমি তাহলে বারো বছর ওদেশে কাটিয়ে বেঁচে ফিরে এলাম কি করে?"

"আপনি বিদ্বান, আপনি যাদুবিদ্যা জানেন,—তাই ওরা কিছু করতে সাহস করে নি।"

হেসে বললেন, "তোমাকে এখন বোঝাতে যাওয়া ভুল। তুমিই দেখো, আমাদের সঙ্গে তাদের অমিল কোথায়।"

ওঁর বিদেশী বন্ধুর বাড়ি গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বাগান!

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ; অবাক হয়ে গেলাম বোন। ওরাও তাহলে প্রকৃতিকে ভালবাসে আর কি ছিমছাম থাকে ! কিন্তু সবই আছে, নেই একটা সোনালি মাছ-ভর্তি পুকুর, একটা আঙিনা ! এ নিশ্চয়ই ওদের সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাব। তাই তো গাছপালা এলোমেলো করে পোঁতা। যা'হোক বাড়ির ফটকে তো এসে পড়লাম। স্বামী না সঙ্গে থাকলে কখন ছুটে পালাতাম !

বাড়ির দোরে ঘা দিতেই একটা 'বিদেশী ভূত' এসে দোর খুলে দিল। স্বামীর মতই বিদেশী পোশাক তার পরনে, কিন্তু মানুষের মতো তার মাথার চুল নয়। কালো আর সোজা তো হবে চুল-তা না পেঁজা এক গাদা লাল পশম যেন। দেখে ভয়ই হয়। চোখ দুটি নুড়ির মত সাদা, যেন সমুদ্রের ঢেউয়ে ধোয়া সাদা নুড়ি। ঠিক আমাদের উত্তর দিকের অধিষ্ঠাতা দেবতার মত। ঐ যে মন্দিরের দরজায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন গো।

আমি তো ভয়ই পেলাম। স্বামী সাহসী, হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা কি ঝাঁকুনিই দিল ! আমার সঙ্গে স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোকটা আবার হাত বাড়ালো ; কিন্তু ছুঁতে সাহস হলো না। কী হাত রে বাবা ! জানোয়ারের মত লম্বা-লম্বা লাল লোমে ঢাকা আবার তাতে কালো কালো দাগ। কুঁকড়ে গেলাম। চীনে রীতিতে অভিবাদন করলাম। সে হাসলো, তারপর আমাদের বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল।

ঠিক আমাদের বাড়ির মতই। ছোট হল, তার আশেপাশে ঘর। একটি ঘরে এসে ঢুকলাম। জানালায় কে একজন বসেছিল। আমার তো মেয়ে বলেই মনে হল। সাদা গাউন পরনে, কোমরে একটা দড়ি না কি বাঁধা। চুলগুলো বেশ পালিশ করে আঁচড়ানো ; তবে খুব হলদে চুল বলেই বিশ্রী লাগে। না গো, ঠিক স্বামীর মতো লাল নয়, হলদেই। নাকটা

খুব খাড়া, স্বামীর মতো অমন বাঁকানো নয়, হাত দু'খানা মস্ত বড়। পা দু'খানার দিকে এবার নজর পড়ল। কুলোর মত যেন ধ্যাবড়া।

আহা, এমন যার চেহারা, তার ছেলেমেয়ে না জানি কেমন দেখতে!

ওরা ভদ্র, কিন্তু আদব-কায়দার কিছুই জানে না, খালি ভুল করে। মেয়েটা এক হাত দিয়ে চায়ের পেয়ালা আমার দিকেই আগে এগিয়ে দিল! স্বামীর আগে আমাকে চা দেয় কেন বাপু! আবার পুরুষটা এল আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে! ওমা, কি ঘেন্না, কি লজ্জা! ওর উচিত ছিল আমার দিকে না তাকিয়ে স্বামীর সঙ্গে গল্প করা। ওর স্ত্রী তো তার জন্যে রয়েছে।

অবিশ্যি যে-দেশের যে-রীতি! ঠাট্টা করা উচিত নয়। কিন্তু স্বামী না বললেন, ওরা বারো বছর এদেশে আছে! এতদিন বসে একটু ভদ্রতা শেখে নি গা! না, না, তোমার ওপর কটাক্ষ করবো কেন বোন, তুমি তো এখন আমাদেরই একজন।

স্বামী বিদেশী মেয়েটিকে তার সন্তানদের দেখাতে বললেন। আভাস দিলেন, আমি শীগ্‌গিরই সন্তানের জননী হতে চলেছি। তাই আমাকে পশ্চিমি সন্তান-পালনের ধারা তিনি দেখতে চান্। মেয়েটি তখুনি আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল। একা যেতে ভয় করছিল। স্বামীর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে ইসারায় যেতে বললেন।

দোতলায় গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল! কোথায় ভয় উবে গেল! ঘরটা গরম রাখবার জন্য চুল্লিও আছে। কিন্তু ঠাণ্ডার ভয়ে জানালা বন্ধ করা হয়নি। একটা জানালা খোলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। দেখলাম, ছেলেমেয়েরা খেলছে। চমৎকার তাদের স্বাস্থ্য! সাদা চুল—আচ্ছা, তোমাদের সাদা চুল বড় হলে কালো হয় কেন? ওদের দুধের মত

সাদা রঙ দেখে মনে হলো, জলে ওষুধ দিয়ে ওদের স্নান করান হয়। স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি সব দেখাল। এখানে ওদের রোজ স্নান করানো হয়। এবার বুঝলাম, ওদের চামড়া অমন ফ্যাকাসে কেন। প্রকৃতি যে লাবণ্য দিয়েছেন, এমনি ধোয়া-পাখলানোয় তা চলে যায়। তারপর কাপড়-চোপড় দেখলাম। নীচে পরবার জামা সব সাদা! সব চেয়ে ছোট খোকাটিরও আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মোড়া! বললাম, "ওর কি কেউ মারা গেছে নাকি!" মেয়েটি বিস্মিত হয়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "সাদা কাপড় পরেছে কিনা নাই! সাদা রং তো শোকের চিহ্ন।

—"না, না, তা নয়," মেয়েটি হাসলো, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যই আমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করি!" তাইতো, বিছানার চাদর, মশারি সবই যে সাদা! বিদেশীদের সব কিছুই আলাদা! অবাক হয়ে গেলাম। সাদা রঙে কেমন যেন এক বিষণ্ণতা আছে। মিইয়ে দিয়ে যায় মন, হতাশা নিয়ে আসে। মৃত্যু আর শোকের ঐ তো রং। ও রং কেন ভাল লাগে ওদের? কেন ব্যবহার করে? ছেলেমেয়েদের তো উজ্জ্বল বাহারে রঙের পোষাকেই সাজাতে হয়। পরাও লাল, হলদে আর ঘন নীল রঙের পোষাক। সদ্যজাত সন্তানের জন্য তো লাল রংই প্রশস্ত। সেই তো আমাদের আনন্দের রং, কিন্তু এরা বিদেশী। এরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে আলাদা!

আরো আশ্চর্য হলাম, ওরা ছেলেমেয়ে বুকে নিয়ে মাই দেয়! কেন, ঝি-চাকরের কি মড়ক লেগেছে। আমাদের বনেদী ঘরে ওসব হবার জোটি নেই।

বাড়ি এসে স্বামীকে সব বললাম।

"ওদের কি একটা ঝি রাখবারও মুরোদ নেই?"

"সন্তানপালন," স্বামী বললেন, "দাসীদের দিয়ে চলে না; তোমাকে নিজের হাতে সন্তান পালন করতে হবে।"

"আমি ?" অবাক হয়ে গেলাম।

"কেন নয়। নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আর দু'বছরের মধ্যে সন্তান যাতে না হয় সেই প্রার্থনাই আমি করবো।"

"তাই কোরো। কিন্তু শিশুপালন মার কাজ, ঝি-চাকরের নয়, একথা মনে রেখো। তোমাদের ওসব বাজে নিয়ম।"

হয়তো, ওঁর কথাই ঠিক। বোন দেখ তো, এত করেও কি ছাই মন পেলাম! উনি তো তেমনি অদ্ভুতই থেকে গেলেন আমার কাছে।

পরদিন শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে দেখা করে বিদেশী পরিবারের কথা বললাম। আহা, ওঁর ছেলেমেয়েদের মত সুন্দর হয় যদি আমার সন্তান! অমনি সোনালী চুল, অমনি স্বাস্থ্য! অমনি দীপ্ত চোখ! লাল ফুলকাটা পোষাকে ওঁদের কত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শ্রীমতী লিউ-ইকে জিজ্ঞেস করলাম: "পুরানো রীতি আপনি মানেন না দেখছি ?"

"মানি, আবার মানিও না। পুরানো রীতির ভালোটুকু নিতে দোষ কি? দেখুন, আমরা যে পোষাক ভিতরে পরি সেটি সাদা, খুলে মাঝে মাঝে কেচে নিলেই পরিষ্কার থাকবে। তেমনি বিদেশীরও রীতি। ওকে আমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ভালোটুকু বিদেশীর কাছ থেকেও নেওয়া যায়—কি বলেন ?

শ্রীমতী লিউ-ই আর আমি ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে

গেলাম। দামী সিল্কের কয়েকটা জামা তৈরি করতে হবে খোকার জন্য। নরম লাল আর বেগনী ফুলদার সিল্ক চাই, কালো মখমলের হবে কোর্ত্তা, আর মাথায় পরাব সাটিনের তাজ। আমি তো আমার খোকার জন্য খারাপ জিনিষ কিনবো না। সরেশ জিনিষ আমার চাই। ভালো জিনিস কেনা যে কি কষ্ট বোন্! দোকানিতো সিল্কের থানের পর থান দেখাতে লাগলো। পছন্দ আর হয় না। আমি তাকে-রাখা কাগজ মোড়া বাণ্ডিলগুলি নামাতে বললাম। সে বুড়ো মানুষ, হাঁপিয়ে গেল। আমি বললাম, আরো আরো দেখাও—কই পাঁচফুল আঁকা সিল্ক তো দেখালে না? বুড়ো তো মহা খাপ্পা। বিড়বিড় করে গালই বুঝি দিল। মেয়েদের ঠমক নিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে কড়া মন্তব্য করলে। হেসে বললাম, "আমার জন্য নয় বুড়ো, আমার ছেলের জন্য।"

এবার সব চাইতে সেরা সিল্ক এনে দিয়ে একগাল হেসে বললো, "নাও মা, ম্যাজিস্টরের বৌয়ের জন্য এনেছিলাম। তা মেয়েদের অত ভালো সিল্কের দরকার কি? তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে নাও।'

এই কাপড়ই আমি চেয়েছিলাম। স্তূপীকৃত কাপড়ের ভিতর থেকে ওর গোলাপি ঔজ্জ্বল্য আমাকে মুগ্ধ করলো। দোকানীও বুঝতে পেরে চড়া দাম হাঁকলো। পছন্দ হয়েছে যখন, নেবই; দামের কথা কে ভাবে! ভাবী সন্তানের মতই সিল্কের কাপড় সযত্নে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি ফিরলাম। দরজী ডাকাই নি। আমার খোকার জামা আমি ছাড়া আর কে করবে? ইস্, ছুঁতেও দেব না! আজ রাতেই তৈরি করবো। আমার খোকাকে বাঘের মুখ-আঁকা জুতো পরাব, গলায় ঝুলিয়ে দেব শতনরী হার! কি চমৎকার-ই না মানাবে! মানাবে না?

[নয়]

তুমি এসেছ নাকি বোন্? ভারি খবর আছে! আজ আমার সন্তান গর্ভের ভিতর নড়ে উঠেছে। কি আনন্দ! ঐ নড়ে-ওঠা যেন আমার খোকার ভাষা!

কাপড় তৈরি হয়ে গেছে। সাটীনের টুপির ওপর বুদ্ধের মূর্তি বুনেছি সোনার জরী দিয়ে। চন্দন কাঠের একটা বাক্স করালুম কাপড়-জামা রাখবার জন্য। খোকা যখন পোশাক পরবে, চন্দনের গন্ধ ওকে খুশি করে তুলবে। আর আমার কিছুই করবার নেই। আর তিন মাস বাকি। এখনো ধান তো ক্ষেতে আছে সবুজ। আরো তিন মাস। এই দীর্ঘ দিন খোকার স্বপ্ন দেখেই কাটাবো। কেমন হবে দেখতে আমার খোকা? দেবী কোয়াঙ্-ইন, দাও মা, দিনগুলোকে এক নিমেষে নিঃশেষ করে, খোকাকে আমার কোলে এনে দাও মা। উড়ে যাক না পাখা মেলে তারা, আসুক, সোনা খোকোন আসুক এখুনি আমার কোলে।

ক'দিনই বা তাকে কাছে রাখবো? ওযে স্বামীর বংশের বাতি, ওঁরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। এইতো কাল ঐ কথা জানিয়ে শাশুড়ী চিঠিও লিখেছেন। শ্বশুর মশাই তো খুব কম কথা বলেন; তিনিও সেদিন আমাকে ডেকে আশীর্বাদ করে এই কথাই বললেন। তাঁর মনে এরই মধ্যে খোকার, তাঁর পৌত্রের জন্ম হয়েছে।

মন বিষিয়ে উঠলো। খোকা আমার নিজের নয়, সমস্ত পরিবারের! ওকে আমরা রাখতে চাই। এই বিদেশী কেতায় সাজানো বাড়ি আর সমস্ত নিয়ম কানুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেব যদি

খোকাকে আমাদের কাছে রাখতে পারি। আমরা তিন জনে বেশ থাকব। কিন্তু আমি তো জানি। সে যে একা আমাদের নয়।

যখনই এ বিষয়ে কথা ওঠে উনি তো উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এক পাল অসভ্যের ভেতর ঝি-চাকরের পরিচর্যায় ছেলে তাঁর বেড়ে উঠবে, হবে বিলাসী আর অমানুষ—এই চিন্তা অহরহ তাঁকে পাগল করে তোলে তিনি খালি ঘরময় পায়চারী করেন। সে দিন তো তিনি বললেনই: "এর চেয়ে তোমার বন্ধ্যা হওয়াই ভাল ছিল।" দেবতারা পাছে রেগে যান, তাই কত সাধ্য-সাধনা করে না ওঁকে চুপ করালুম। ছিঃ যা রীতি তা তো মানতেই হবে।

রীতিকে মানবো না, তা কি হতে পারে! আমার বুক শূন্য হয়ে গেলেও আমার ভাবী সন্তানকে পরিবারের জন্য উৎসর্গ করবো। সে হবে বংশের গৌরব।

স্বামী সেই থেকে আর এ সম্বন্ধে কোনো কথাই তোলেন নি। হয়তো, পিতৃকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সংকল্প করছেন। আমিই বা, ওসব ভাববার অবসর পাচ্ছি কই? খোকা আসছে, তারই আনন্দে আমার প্রাণ ভরে গেল।

বোন,

ভেতরে-ভেতরে তিনি যে এক কাণ্ড করে বসে আছেন, কী করে জানবো বল। তিনি ভুল করলেন কিনা কি করে বলব। উনি যা করবেন আমার কাছে তাইত ঠিক। তিনি নাকি শ্বশুর মশাইকে গিয়ে বলেছেন, স্ত্রীর মত ছেলেও তাঁর নিজস্ব—বংশের কোনো দাবি-দাওয়া তার ওপরে নেই! একথা কি করে বললেন উনি!

ওঁর বাবা-মা শুনে খুবই রেগে গেলেন। আর রাগ হওয়া

কথাও বাপু। ছেলে কি না ঐ কথা বলে! উনি কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করলেন না। শেষে ওর বাবা কেঁদে ফেললেন। ছিঃ, উনি বাবাকে কাঁদালেন! এই কি শিক্ষা! কিন্তু কি পাষাণ প্রাণ, একটু গললো না!

আমার কিন্তু ভালোই হলো। খোকাকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে হবে না, আমার খোকা আমারই থাকবে। উনি যেদিন সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসেন, মনে মনে ওঁকে তিরস্কার করেছিলাম, আজ কিন্তু পুজো করতে ইচ্ছে হলো। মাতৃস্নেহ কি অন্ধ! খোকন, আমার সোনা খোকন, তোমাকে তো আমি চোখের আড়াল করবো না। খোকা যে আমার—আমার! ওকে কাউকে ভাগ দিতে হবে না। আমি ওর মা, ওকে দেখব, স্নান করাব, কাঁদাব। আমার কাছে কাছে রাখব সারা দিন আর রাত। ওর ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা-পিসির পাল এসে ভাগ তো বসাবে না।

দেবতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ! তাঁদের আশীর্বাদেই এমন উদারচেতা স্বামী পেয়েছিলাম। তাই না খোকাকে একান্ত আপনার করে পাবো। স্বামীর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। আমার স্বামী না-ই হলেন খাঁটি চীনা—বরং তিনি আধুনিক হয়ে তো ভালই হোলো।

মাঠের দিকে রোজ চেয়ে দেখতাম, সবুজ ধানে নুয়ে পড়েছে গাছ-গুলি। সূর্যের যা তেজ, আর ক'দিন পরেই সোনার রঙ্ দেখা দেবে। চাষীরা ধান কেটে নিয়ে যাবে। আনন্দের আভা তাঁদের মুখে চোখে ফুটে উঠবে। ...শুভ বর্ষেই খোকা আমার জন্ম গ্রহণ করবে।

আর কতোদিন কাটাবো এই স্বপ্ন নিয়ে?

স্বামীর ভালোবাসার কথা ভুলেই গেছি। শুধু খোকার চিন্তা। খোকা আগে জন্ম গ্রহণ করুক, স্বামীর বিষয় তারপর ভাববো। আর ভাববারই বা দরকার কি? তখন তো ওর মন আমার জানা হয়ে যাবে, আর উনিও জানবেন আমার মন।

বোন, বোন! এই তো আমার খোকা। আমার কোলে শুয়ে আছে। কালো আবলুস কাঠের মতো ওর চুলের রং!

দেখ—দেখ—এমন সুন্দর তো আর হয়ই না। ওর হাতগুলি কেমন গোদা গোদা, পা দেখে মনে হয় যেন ওক গাছের চারা। আমি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি ওর সারা শরীর, ওকে চিনেছি। ও যেন দেবশিশুর মতোই সুন্দর আর সবল।

বোন, দেখ, দেখ, খোকার কাণ্ড দেখ! শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে দেখো না। কি দুষ্টু ছেলে! এখুনি কান্না জুড়ে দিয়েছে মাই খাবার জন্যে। এইতো খাইয়েছি, ঘণ্টাখানেকও হয়নি। কিন্তু ওর যা জুলুম! যখন যেটা ধরবে—সেটাই চাই।

হাঁ—কি বলছিলুম? খোকা হওয়ার আগের কথা? রাতদিন খোকার স্বপ্নে বিভোর হয়েই কাটতো! স্বামী আমার দিকে তাকাতেন; তাঁর দৃষ্টিতে আনন্দ আর আশঙ্কা ঘন হয়ে উঠত। আমি জানালার ধারে অস্থির হয়ে পায়চারী করতাম। কবে, কবে আসবে খোকা? বাইরে পাকা ধানের মঞ্জরী বিকেলের সোনালী আলোয় যখন ঝলমল করতো, তখন আমাকে যেন পরিপূর্ণভাবে তার ভিতর দেখতে পেতাম। পৃথিবী আর নারী! পৃথিবীর পরিপূর্ণতা ফলে ফুলে, আর নারীর—সন্তানে।

ওরা একদিন কাটতে এল সোনার ধান, ধানের ছড়া স্তূপাকার হয়ে উঠলো। বছর পূর্ণ হয়ে এসেছে—আর এসেছে জীবনের পরিপূর্ণতা।

সূচি মুখ ব্যথা উঠ্‌তো। চুপ করে থাকতাম। এই ব্যথাইতো তার আগমনের ইঙ্গিত। আমার নারীত্বের উচ্চ শিখরে তখন

আমি। তারপর একদিন খোকা ভূমিষ্ঠ হলো, আমার সোনার খোকা! ওর শক্তিও আছে। ও তো জীবনের কটক জোরে খুলে দিয়ে এল পৃথিবীতে। আর কি ওর চিৎকার! ওর শক্তি তো অসহ্য ব্যথা হয়ে উঠলো আমার কাছে। আমি কাঁদলাম, তারপর ওর শক্তি আমাকে দিল জয়টিকা। আমার সোনার খোকা। আমার জীবন দলে দলে ফুটে উঠলো। কি আমার আনন্দ! তোমাকে সবই বলি বোন। আমার জীবনের সব কথাই তো তোমাকে বলেছি।

দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দুর্বলতা আমাকে অভিভূত করতে পারে নি, এযে আমাদের জয়ের গৌরব। স্বামী দাইয়ের কাছে খবর পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। তিনি বিছানার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দুলে উঠলো আমার বুক। তিনি সেই পুরানো রীতিই তাহলে বজায় রাখতে চান! খোকনকে তাঁকে উপহার দিতে হবে। কোনোরকমে উঠে বসে খোকাকে তাঁর কোলে বসিয়ে বললাম, "স্বামী, এই আপনার পত্নীর উপহার। তাকে গ্রহণ করে পত্নীকে কৃতার্থ করুন!"

কেমন নাটুকে কথা নয়? কিন্তু ঐ বলার নিয়ম যে! তিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছিলেন। ওঁর চোখের আলোয় বিবশ হয়ে গেলাম। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন:

"এ-দান আমি গ্রহণ করে কৃতার্থ হলুম। কিন্তু পুত্রতো আমার একার নয়, তোমারও। তোমার হাতে আবার তাকে সঁপে দিলুম।" রুপোলি ধারার মতো ঝরে পড়লো তাঁর কথা। তিনি আমার স্বামী। আমাকে তিনি ভালোবাসেন!

বোন, কাঁদছো! আমিও কেঁদেছিলাম। অত আনন্দেও চোখে জল আসবে না! ওমা, কি নিষ্ঠুর খোকাটা! আমাদের চোখে জল দেখে হাসছে!

দ্বিতীয় পর্ব

[এক]

বোন

এখন থেকে আর তোমার কাছে দুঃখের কাঁদুনি গাইব না। আমার আবার দুঃখ কি ? স্বামীর মন পেয়েছি, খোকা, আমার সোনার খোকা কোলে এসেছে ! দুঃখকে কি আর কাছে ঘেঁষতে দেব ? কিন্তু দুঃখ নাকি ফুরোয় না। বোন, কোন্ দিক দিয়ে অতর্কিতে সে আক্রমণ করে, দেবতারাই জানেনা, মানুষ কোন্ ছার। রক্তের সম্বন্ধ যতদিন আছে, ততদিন আছে এই দুঃখ।

না, না, খোকার অসুখ নয়। ন' মাসে পড়েছে আমার খোকনমণি ! ঠিক যেন বুদ্ধটি ! একেবারে ধ্যানী বুদ্ধের মতো বসে থাকে। কিন্তু দুষ্টুও কম নয়। কি একগুঁয়ে আর দুষ্টু বাবা ! হাঁটতে শিখে আর একদণ্ড বসতে চায় না ! ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। বসতে গেলে রাগ দেখে কে ! উনি তো বলেন, আদর দিয়ে আমি ওকে নষ্ট করছি। কিন্তু কি করবো, অমন খোকাকে কি আর প্রাণ ধরে গাল দেয়া যায় ! হাঁ, তারপর দুঃখের কথা বলছিলাম, না ?

এবার দুঃখ দিল দাদা। তুমি তো জানোই, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। কি ভালই না বাসতাম দাদাকে ! তারপর অনেকদিন খবরই পাইনি। আজ তিন বছর ও আমেরিকায়। ওই তো মার বুক থেকে রক্ত শুষে নিলে, আমার বুক থেকেও বুঝি।

মার কাছে খবর জানতে চাইলে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন, তাঁর নিষেধ না মেনে চলে গেছে, এ অপমান তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন

কিনা সন্দেহ! এমন কি বিয়ে করে যেতে বলেছিলেন, সে কথাও রাখে নি। তিনি তো তাঁর নামও মুখে আনেন না।

দাদা মার শান্তজীবনে আবার উপদ্রব হয়েই এল। কিছুতেই কি দাদাটা মাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না! মার নিষেধ অমান্য করেই দাদা ক্ষান্ত হয়নি, সেদিন ওয়াঙ্-ডা-মা মার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিল। এই যে চিঠি খানা। বুড়ি খোকাকে খুব আদর করল, তারপর চিঠিখানা দিল আমার হাতে। চোখে জল দেখলাম যেন! ও আমাকে আর দাদাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, মাই দিয়ে বাঁচিয়েছে। আমাদের বাড়ির সব কিছুই ওর জানা। ওর হাবভাব দেখে তো ভয়ে বাঁচিনে!

তবে কি মা নেই। দেখে এসেছিলাম, তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। একটিবার শেষ দেখাও হোলো না! জীবনের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল বুকের খাঁচায়; কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। এবার ওয়াঙ্-ডা-মাকে জিজ্ঞেস করলাম, চেঁচিয়েই উঠলাম: মা মার কিছু হয়েছে? মার শেষ-দেখা ছবিখানি ভেসে উঠলো। লাঠি ভর দিয়ে ছাড়া তো দাঁড়াতে পারেন না। মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়লেন। মার কাছে যাওয়াও আর তেমন হয়ে ওঠে না, নিজেকে নিয়েই মত্ত হয়ে আছি। নানা অশুভ চিন্তা জুড়ে বসলো মনে।

"না গো, না" সে বুড়ি উত্তর দিল, "সে মরলে তো চুকেই যেত। দেবতারা তাকে অখণ্ড পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছেন, নইলে দুঃখটা সইবে কে!"

"বাবা?"

"তোমার বাবাও নয়। তিনিও হলুদ ঝরনার জল খান নি। চিঠিখানা আগেই পড়েই দেখ মেয়ে।" সে চিঠিখানা আমার হাতে দিল।

খোকাকে ঝির কাছে দিয়ে ওয়াঙ্-ডা-মার জন্তে চায়ের ব্যবস্থা করে নির্জনে গিয়ে লেফাফাখানা খুললাম, খুলতেই মার লেখা চিঠি বেরিয়ে পড়লো। আমার কাছেই লিখেছেন। অবাকই হলাম। মা আমাকে আগে কখনো তো চিঠি লেখেন নি! কুশল প্রশ্ন করে অবশেষে মা লিখেছেন:

"তোমার দাদা কয়েক মাস হোল বিদেশে গেছে। আজ তার চিঠি পেলাম, সে একটি বিদেশী মেয়েকে বিবাহ করতে চায়।"

তারপরে চিঠি শেষ করবার বাঁধা গৎ। আর কিছু লেখা নেই। তবু ঐ দু'ছত্র লেখায় যেন কত ব্যথা ফুটে উঠেছে। মার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের পরিচয়। দাদাটা কি! ওকথা মাকে কি করে লিখলে? কুপুত্র!

চিৎকার করেই উঠেছিলাম বুঝি! বলেছিলাম, ওরে নিষ্ঠুর, ওরে উন্মাদ, ওরে পাপিষ্ঠ, ওরে কুপুত্র, তুই কি করলি! ঝিরা দৌড়ে এসে বারণ করল; উত্তেজিত হোলে নাকি স্তনের দুধ বিষাক্ত হয়ে যায়। খোকার মুখ চেয়ে শান্ত হলাম, ওদেরও চুপ করতে বললাম। ওয়াঙ্-ডা-মাকে এবার ডেকে পাঠালাম। চুপ করলাম বটে, কিন্তু চোখের জল তো বাগ মানে না। সে তো প্রবল বন্যার মতো দুকূল ছাপিয়ে এলো। তাকে রুখতে গেলাম, পারলাম না। তারপর মেঝেয় ভেঙে পড়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলাম। রাগ আর উত্তেজনা গলে গলে পড়তে লাগলো। ঝিগুলোর আমাকে ঘিরে কি কান্না! একসময়ে কেঁদে কেঁদে চুপ করে গেলাম, ওদের মরা কাঁদুনি তখনো চলছে। ওদের থামতে হুকুম দিয়ে নিজে ওয়াঙ্-ডা-মাকে বললাম, "আর একটু বোসো, উনি আসুন। ওঁকে চিঠি দেখাই, দেখি উনি কি বলেন। তারপরে তোমার সঙ্গে গিয়ে মাকে দেখে আসব।"

বুড়ি রাজি হলো। ওর জন্যে শুয়োরের খানিকটা মাংস আনতে বললাম, তারপর ওকে নিজে সুমুখে বসে খাওয়ালাম।

আমার ঘরে স্বামীর আসার অপেক্ষায় বসে থেকে দাদার কথাই মনে পড়ছিল। যতই চেষ্টা করি না কেন, এখন ওকে কেমন দেখায়, কে জানে! বিদেশী পোশাকে যখন ওর প্রেমিকার সঙ্গে বেড়ায়, কেমন লাগে দেখতে? কি জানি, দাদার ছেলেবেলার চেহারার সঙ্গে তো এসব খাপ খায় না! অমন ছেলে কিনা বিদেশী কোর্তা পরে ঐ অদ্ভুত দেশের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের সঙ্গে ওদেরই ভাষায় কথা বলছে! এসব তো ভাবতে পারি না, আমি যে দাদাকে ছেলে-বেলায় চিনতাম—তার কথাই মনে পড়ে।

ছেলেবেলায় কি সুন্দরই না ছিল দাদা! আমার চেয়ে অনেক লম্বা, খেলা ধুলায় যেমন তেমনি বলা-কওয়ায় ওস্তাদ। হাসতে ওর মতো কে পারতো! উঠোনে যখন খেলা করত, উপপত্নীরা দেখে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরত। ওরা সাধারণ ঘরের মেয়ে, ওদের ছেলেমেয়েরা কি আর মার ছেলেমেয়ের মত হবে! বাঁদীর ছেলেমেয়েদের কি পুরু ঠোঁট, ভ্রূ নয় তো যেন কুকুরের ঝাকড়া-ঝাকড়া লোম! মা কত বড় বনেদী বংশের মেয়ে। কই অমন রূপ তো আজও আমার চোখে পড়ল না। দাদা তো তাঁরই ছেলে। মার মতোই তার লম্বা মুখ, পাতলা তার ঠোঁট—আরও চোখের উপরে তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুই ভ্রূ। এক কথায় মার রূপ যেন পেয়েছে ছেলে। শুধু পুরুষালিটুকু ওর নিজের। কিন্তু ঐ পুরুষালি নিয়েই ব্যস্ত।

"হাঁ, দাদা গ্রাহ্যই করত না ওসব। বলতো, বেটা ছেলের আবার ওসব দরকার কি! দাসীরা যখন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে

আসতো, ও তাদের ঠেলে সরিয়ে দিত। ওরা যখন তার মন পাবার জন্য মিষ্টি কথা বলত, ওর ভাল লাগতো না। প্রসাধনের কথা উঠলে তো দাদার মাথায় খুন চড়ে যেত। ও ভালোবাসত খেলাধূলা, হৈচৈ-হল্লা-হুল্লোড়। ওর খেলার সাথী ছিলাম আমি। কিন্তু খেলার সময় ওকে কখনো চটাতে সাহস করিনি। একে তো ও ছেলে, আমার মতো একটা মেয়ে ওকে চটাতে যাবে! সে সাহস কোথায়? আর আমি তো ছিলাম ওর ভক্ত। ও যা বলতো তাই-ই করতাম। এত ভালবাসতাম ওকে!

হাঁ, দাদার কথাই বলছি বোন। দাদা ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ রাগী আর একগুঁয়ে। ঝি-চাকর থেকে সুরু করে মা পর্যন্ত ওর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন। না, না, দাদা অবাধ্য হলে তাকে ক্ষমা তিনি করতেন না। কিন্তু তাকে হুকুম করতে গিয়ে অনেক সময় সতর্ক হতে দেখেছি। একদিন দাদার খেতে বসবার আগে টেবিল থেকে চর্বিতে ভাজা পিঠে তুলে নিয়ে যেতে বললেন। দাদার তখন অসুখ; যদি খেতে চায় তো কোন রকমেই তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

দাদার দুর্দমনীয় ইচ্ছের কাছে সবাইকেই মাথা নোয়াতে হোত। সে যা চাইত, তাই পেত, একসঙ্গে মানুষ হয়েও এই আকাশপাতাল প্রভেদ দেখে আমি অবাক হই নি। সে বংশের গৌরব, তার আদর একটা মেয়ের চাইতে বেশি হবে বই কি! কত কর্তব্য তার!

দাদাকে তখন কত ভালই না বাসতাম! একদণ্ড তাকে না হলে আমার চলত না। বাগানে আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, পুকুরে সোনালী মাছের খেলা দেখেছি। শ্যাওলার নিচে থেকে যখন মাছগুলো জেগে উঠতো কতদিন কোন্‌টা ওর মাছ, কোন্‌টা আমার তাও ঠিক করেছি। একবার কতকগুলো নানা রঙের নুড়ি কুড়িয়ে একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরি করেছিলাম। ওর কাছেই আমার প্রথম অক্ষর পরিচয়।

ওরই লেখা অক্ষরের উপর দাগা বুলিয়েছি আমি। ওকে তো আমি তখন মস্ত পণ্ডিত ভাবতাম। দাদা বাইরে গেলে আমি ফটকের কাছে চুপ করে থাকতাম, কিছুতেই কেউ সেখান থেকে নড়াতে পারত না। দাদা ফিরে এলে—তবে এক সঙ্গে যেতাম! এককথায় বলতে গেলে দাদার ছায়া হয়ে ছিলাম, বোন! তারপর ন' বছর বয়েসে হল ছাড়াছাড়ি। সে চলে গেল বাইরের মহলে—বাবা যেখানে থাকেন সেখানেই হোলো তার ঠাঁই। আমাদের জীবন চলছিল এক তারে বাঁধা হয়ে, তার ছিঁড়ে গেল।

প্রথম ক' দিন খুব কেঁদেছিলাম। দিনের বেলা বাড়ির এঘর-সে ঘর দাদার খোঁজে ঘুরে বেড়াতাম। সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যেতাম, স্বপ্ন দেখতাম: আমি আর দাদার পরীর রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি; সে রাজ্যে বিচ্ছেদ নেই, চিরমিলন। সেখানে যেন আমরা চির শিশু। তারপর স্বপ্ন ভেঙে যেত, তখন তো চলতো শুধু কান্না আর কান্না। চোখের জল আর শুকোয় না গো। দিন আর রাত যেন একাকার হয়ে যেত আমার কাছে।

আমাকে শুকিয়ে যেতে দেখে মা একদিন বললেন: "ভাইয়ের জন্য এত দরদ দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই, কিউ-ই-লান। সময় আসছে, যখন স্বামী ও সন্তানের জন্য এর প্রয়োজন হবে। এমন দুঃখ মানুষ স্বামী আর সন্তানের জন্যই করে থাকে। দাদাকে ভুলে যাও। লেখা-পড়া শেখো, ছুঁচের কাজ কর। যা বাডন্ত গড়ন, বিয়ের বয়স তো হয়ে এল!" তারপর থেকে আসন্ন বিয়ের কথায়ই আমার জীবন ভরে উঠলো। প্রতি কথায় চলায় বলায় বিয়ের দিকে চোখ রেখে চলবার হুকুম আর উপদেশ আসতে লাগলো।

মা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "ছেলে আর মেয়ের জীবন কখনও একভাবে চলতে পারে না। ছেলে বংশের গৌরব, পিতৃপুরুষ তার

হাতের শিশু পাবার জন্য প্রত্যাশী। মেয়ে বংশের কেউ নয়, যে-বংশের সে বাগদত্তা, সেই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তাকে। তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা।" কি আর করব, বিয়ের পড়ায়ই মন দিলাম।

আর একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে! দাদা পিকিঙে ইস্কুলে পড়তে যাবে, মার অনুমতি নিতে অন্দরে এলো, আমিও সেখানে বসেছিলাম। দাদাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল ধূসর রঙের রেশমের পোশাকে! ওর বুড়ো আঙুলে একটি আঙটি, তাতে পাথর বসানো। দাদা আবার একটু সৌখিন কিনা—নিজে সুন্দর, তাই সুন্দর জিনিসই ওর পছন্দ। সেদিন ওকে যেন রুপোলি রঙের সরল শরগাছের মতোই দেখাচ্ছিল। মার কাছে এসে মাথা নুয়ে বললো, "মা, পিকিঙে পড়তে যাবার তুমি যদি অনুমতি দাও তো যেতে পারি।"

মা জানতেন, তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রাখে নি দাদা। দাদা বাবার অনুমতি পেয়েছে। মার কাছে বলা তো শুধু মার মন রাখা। বাবা যা বলবেন, তার উপর কথা বলার তো মার সাধ্য নেই। কিন্তু দাদা মাকে ভালবাসে, তাই তাঁকে দুঃখ দিতে চায় নি। মাও জানতেন মুখের কথায় তাঁকে দিতে হবে সম্মতি। তাঁর ক্ষমতা থাকলে তিনি তো বাধাই দিতেন। অপরের মতো তিনি অভিযোগ করলেন না, কাঁদলেন না, শান্ত, দৃঢ় স্বরে বললেন, "তোমার বাবার মতেই আমার মত! আর স্ত্রীলোকের মতের কিই-বা দাম! কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, বাড়ি ছাড়বার কি প্রয়োজন ছিল? তোমার বাপ-ঠাকুর্দা এইখানেই লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে কত বিদ্বান রয়েছেন, তাঁদের কাছে তো শিখতে পারতে? তারপর তোমার জন্য তুয়েন থেকে পণ্ডিত তা-আঙকে আনানো হলো, তবুও তোমার বিদেশী শিক্ষার বাই গেল না। অথচ কি কাজে লাগবে এ শিকা? তুমি খনেদী পরিবারের ছেলে, তোমার আচার ব্যবহারের সঙ্গে তো খাপ

থাবে না। আর বাইরে গেলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে। তবুও যদি যেতে চাও, যাও, বাধা দেব না; কিন্তু মনে রেখো, আমাদের কাছে, বংশের কাছে, এখনও তোমার কর্তব্য শেষ হয় নি। বিয়ে করে গেলে—”

দাদা পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। এবার রেগে-মেগে পাখাখানা বন্ধ করে ফেললে। সে চোখ তুলে মার দিকে তাকাল, চোখে তার প্রতিবাদের ভাষা।

দাদা বিয়ের নাম শুনে ক্ষেপেই গেল বুঝি! মা একখানা হাত তুললেন। তাকে যেন বাধাই দিলেন। বললেন, ‘কথা বোলো না। বলেছি তো, আমার মতামতের কোনো দাম নেই। তবে, মা—এই হিসেবেই সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার জীবন তোমার একার নয়। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না।’

দাদা চলে গেল।

এই ঘটনার পর দাদাকে খুব কমই দেখেছি। আমার বিয়ের আগে মাত্র দু'বার বাড়ি এসেছিল। দু'দণ্ড কথা বলারও অবসর হয় নি। মার সঙ্গে দেখা করে দু-একটা কথা বলে সেই যে সদরে চলে যেত আর আসতো সেই যাওয়ার দিন। গুরুজনের সামনে কি ওর সঙ্গে কথা বলা চলে! নইলে ঝগড়া করবার জন্য তো কোমর বেঁধে তৈরীই ছিলাম।

চেহারাও বিদেশে থেকে তার বদলে গিয়েছিল! ছেলেবেলার কোমলতাটুকু আর ছিল না। অথচ আগে ওকে দেখলে সুন্দরী মেয়ে বলেই ভুল হোত। মা একদিন কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললে, স্কুলে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়। তাতেই নাকি ও অমনি লম্বা-চওড়া হয়ে উঠেছে। মাংস-পেশিও এখন মজবুত। গোলগাল শরীর নাকি মেয়েদের জন্য! চুলও ওর ছোট করে ছাঁটা। বিপ্লবের সময়

থেকে তো ঐ নিয়ম চলে আসছে। আমাদের তো বাপু কাঠখোট্টা চেহারা থেকে গোলগাল নধর গড়নই ভাল লাগে! দাদার কী সুন্দর চেহারাই না ছিল! ওকে দেখে বাবার প্রথমা উপপত্নী একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছিল:—

"ওর বাপ যখন অমনি সুন্দর ছিল, তাকে ভালোবেসেছিলাম।"

দাদা পিকিঙ থেকেই বিদেশে চলে গেল! পাড়ি দিল সাত সাগর। আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। তার কথা প্রায় ভুলেই গেছি। আমার মনে আবছা হয়ে গেছে তার স্মৃতি। সে যে অপরিচিত পরিবেশে আছে, তাতে আরো অচেনা হয়ে গেছে। আর তো তাকে তেমনটি দেখতে পাব না। আজ চিঠিটা হাতে নিয়ে তার কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, টুকরো-টাক্‌রা ঘটনা ছাড়া কিছুই মনে নেই। দাদা আজ বিদেশীর মতই অপরিচিত।

স্বামী ফিরে আসতেই কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে চিঠিখানা দিলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে নিয়ে বললেন, কি ব্যাপার? বললাম, পড়ে দেখুন—পড়ে দেখুন! আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। চিঠি পড়ে বললেন, "মূর্খ, এমন কাজ সে কি করে করলো! তুমি গুছিয়ে নাও, তোমাকে মার কাছে যেতে হবে। দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার আর কে আছে।"

আমাদের নিজেদের রিক্সা আছে। রিক্সাওলা ওঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে সবে খেতে বসেছিল। উনি চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালেন যাতে সে চটপট খেয়ে নেয়। রিক্সাওলা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। খোকা আর খোকার ঝিকে নিয়ে রিক্সা করে মার ওখানে গেলাম।

বাড়িটা যেন থম্‌থম্‌ করছে। যেমন করে মেঘ ঢেকে দেয় চাঁদকে, তেমনি এক নীরবতা ঢেকে দিয়েছে বাড়ীর গোলমাল। ঝি-চাকরেরা এখানে ওখানে ফিস্‌ফিস্‌ করছে। আমাকে দেখেই তারা চুপ করলো। দেখলাম, দ্বিতীয়া আর তৃতীয়া উপপত্নী উইলোর ছায়ায় একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। এতদিন পরে দেখা, কোথায় কুশল প্রশ্ন করবে, তা না বললে, "খোকাটি তো চমৎকার হয়েছে! দিব্যি মোটাসোটা।"

হতভাগীরা আমার খোকনের ওপর নজর দেয় কেন?

তৃতীয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা কোথায়?"

"ঘরেই আছেন। আজ তিন দিন ধরে চাল ডালের বরাদ্দ দিতে একটিবার বেরোন মাত্র। কি গম্ভীর, আমাদের কথা ব'লতেই সাহস হয় না! যেন পাথরের মূর্তি। ওঁর চোখ দেখলে ভয় হয়। তুমি দেখা করে এসো, তোমার কাছেই শুনবো সব। ভাই, খোকাকে রেখে যাও না।"

"না", বললাম, "মাকে দেখাব। দেখি, দুঃখে একটু যদি সান্ত্বনা পান!"

অতিথিদের পান-ভোজনের হল-ঘর ছাড়িয়ে পিয়নি ফুলের বাগান পার হয়ে অন্দর মহল। তারই আবার এক কোনে মার ঘর।

মার ঘরের সুমুখে এসে দেখলাম, দরজা বন্ধ। সব সময়েই লাল সাটিনের ভারি পর্দা ঝোলে দরজায়। দরজা খোলাই থাকে। আজ কিন্তু দরজাটিও বন্ধ। আস্তে আস্তে টোকা দিলাম, উত্তর নেই। ডাকলাম, "মা, দরজা খুলুন, আমি।" বহুদূর থেকে সাড়া এলো: "এসো মা, এস। দরজা ভেজানো আছে।"

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম। মা বসে বই পড়ছেন। দেয়ালে কণফ্যুসিয়াসের বাণীর সুমুখে ধূপ জ্বলছে। আমাকে দেখে বই মুড়ে

রেখে বললেন. "এসেছ, মা! ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলাম, শান্তি পেলাম না।" মাথাটা একটু নাড়লেন, বইখানা মেঝেয় পড়ে গেল। তুলে নিতেও যেন মন নেই।

মাকে এত মুষড়ে পড়তে কখনো দেখি নি! মা চিরদিন সংযত; দুঃখের ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে অনেক বয়ে গেছে। কিন্তু আজ একেবারে ভেঙে পড়েছেন। হবে না? আমার খোকন যদি দাদার মতো অমনি কখনো অবাধ্য হয়, তাহলে কি হবে আমার? না গো, না ওসব ভাবতেও পারি না। আর নিজেকেই গাল দিতে ইচ্ছে করে বাপু। আমি স্বামীর সোহাগ পেয়ে মার কথা ভুলেই গিছলাম। সংসার—স্বামী-সন্তান এই নিয়েই ছিলাম ব্যস্ত। অনেক দিন পরে তো এলাম এবার। কি করে ওঁকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেলাম না।

মা খোকনকে তিন মাস বয়সে একবার দেখেছিলেন, নতুন করে আবার দেখলেন যেন। তা খোকাতো আমার নিতুই নতুন! দেরাজ থেকে একটা লাল কেকের বাক্স বার করে ওর হাতে দিলেন। খোকা বাক্সটা বুকে আঁকড়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

মাও হাসলেন। আমার যাদুমণির হাসি দেখে কেউ না হেসে পারে!

"খাও", মা খোকনকে আদর করে বললেন, "খাও খোকনমণি আমার, পদ্মের কলি খাও।"

আমি চা তৈরি করে মাকে এগিয়ে দিলাম!

তিনি খোকার খেলাই দেখছিলেন! ভাবলাম, এই অবসরে দাদার কথা তুলবো কিনা! না, তিনি কি বলেন দেখিব। তিনি হয়তো দাদার কথা তুলতেই চান না। আর হোলোও তাই। তিনি সে প্রসঙ্গ না তুলে বললেন, "কি, ছেলে কোলে পেয়ে খুশি হ'য়েছ তো, মা! ছেলে নাকি হবে না!"

মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম। মনে পড়লো সেই রাতের কথা, যেদিন আমার দুঃখ ঝরে পড়েছিল। আমার ব্যথায় যার মন ভারী হয়ে উঠেছিল। আজ তো সে দুঃখ নিশা আর নেই। আনন্দময় প্রভাত যে এসেছে, এসেছে নতুন আলোর ধারা।

"খুশি হয়েছো তো, মা ?" তখনও তিনি খোকাকে দেখছিলেন।

"উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।" গলার স্বর লজ্জায় বুজে আসছিল।

"খোকাটিতো তার পরিচয়," মা বললেন, "সুখী বাপ-মার এমন সুন্দর সন্তান হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, ওতো সর্বাঙ্গ সুন্দর। কোনো খুঁত নেই। তোমার দাদা, সেও এমনি সুন্দর ছিল। তখন যদি মরে যেত, আজ কাঁদতে পেতাম। থাকতো একটি সুন্দর, বাধ্য ছেলের স্মৃতি। কিন্তু সে তার উপায়ও রাখে নি, সে অবাধ্য !"

মা তাহলে দাদার বিষয় দিয়ে আলোচনা করতে চান! দেখি, কিভাবে তিনি শুরু করেন! আমি তো কথাটি কইব না। কি জানি কি ভেবেছেন। কিছু বলে কি শেষে একটা বিপত্তি বাধাব। কিছুক্ষণ কেটে গেল তিনি এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাব চিঠি পেয়েছিলে ?"

"হঁা।" আপনার চিঠি ওয়াঙ-ডা-মার আজ ভোরেই নিয়ে গিছলো। তাই এলাম। উত্তর দিলাম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন যেন! তারপর উঠে গিয়ে লিখবার টেবিলের টানা খুলে সেখান থেকে একখানা চিঠি বার করলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এবার ফিরে এসে চিঠিখানি আমার হাতে দিলেন। আমি মাথা নুয়ে দু'হাত পেতে চিঠিখানা নিলাম। তিনি বললেন, 'পড়ে দেখ !'

চিঠিখানা লিখছে দাদার বন্ধু চু দাদার অনুরোধে। সেও একসঙ্গেই পিকিঙ্ থেকে মার্কিন মুল্লুকে যায়। বাঁধি গতের পর জানিয়েছে, দাদা আমেরিকায় তারই এক শিক্ষকের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। বাপ-মার সম্মতি প্রার্থনীয়। আর লী-দের সম্বন্ধ যেন ভেঙে ফেলা হয়। এ বিবাহ সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে তার মন চিরদিনই বিষিয়ে উঠেছে। বাবা-মার সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা অটুটই আছে, কিন্তু তাঁদের কথা রাখতে সে অক্ষম। সময় বদলে গেছে। চীন দেশের রীতি অনুসারে সে বিয়ে করতে নারাজ। বাবা-মা তাকে অযোগ্য পুত্র মনে করতে পারেন; কিন্তু পুরোনো বাগদান পদ্ধতিতে সে বিশ্বাস করে না, কোনো অধুনিক মানুষই তা করতে পারে না। সে আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে তাই স্বাধীন পদ্ধতি গ্রহণ করছে। এ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, নড়চড় হবে না।

শত কোটি প্রণাম এবং শত মার্জনা জুড়ে দিয়ে বন্ধুকে দিয়ে দাদা এই চিঠিখানা লিখিয়েছে। চিঠি পড়তে-পড়তে দাদার বিরুদ্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠছিলাম। পড়া শেষ হলে মার হাতে চিঠিখানা দিয়ে চুপ করে রইলাম।

মা বললেন, "শক্ত পাগলামীতে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্য বিজলী-চিঠি পাঠিয়েছি।"

মা যে কত অধীর হয়ে পড়েছেন, তার পাঠানোর কথা শুনে বুঝতে পারলাম। মা সাবেক কালের মানুষ। যখন আমাদের এই পুরানো দিনের সুন্দর শহরের পথে পথে লম্বা লম্বা খুটি পোঁতা হোলো, আর তার সঙ্গে মাকড়সার জালের মতো তার জড়িয়ে দেওয়া হোলো, তিনি এরই বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন। একদিন মাকে বলতে শুনেছিলাম, "আমাদের পূর্বপুরুষরা কলম আর হরফের আবিষ্কার করেছিলেন, আজ আমরা তার অপমান করতে বসেছি। পূর্বপুরুষদের অক্ষর আর ভাষা

ছিল কত ধীর, গম্ভীর, আর এখন সেখানে এল তাড়াতাড়ি সারবাব ক্ষেপামি।"

বহু দূরদেশে খবর পাঠানো যায় শুনে জ্বলে উঠেছিলেন—"দূর দেশ? অসভ্যদের দেশে খবর পাঠিয়ে কি হবে? দেবতারা আমাদের সভ্যতাকে সমুদ্র দিযে ঘিরে ওদের বর্বরতার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আমরা আজ দেবতার ওপর খোদ্‌কারী করছি, নিজেদের বুদ্ধিকে বড় বলে মনে করছি।"

আজ কত অসহায় হয়েই না তাঁকে সেই বিদেশী যন্ত্রের সাহায্য নিতে হলো। বললেন, "ভেবেছিলাম, নেব না বিদেশী কলের সাহায্য, মরুক সে বিদেশে। কিন্তু আবাব ভাবলাম, সয়তানের পেছনে সয়তানকে লেলিয়ে দেয়া অধর্ম তো নয়।"

মাকে সান্ত্বনা দিলাম, "মা, দাদা তো অবুঝ নয়। নিশ্চয়ই বিদেশী পেত্নীটাকে ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরবে।"

মা মাথা নাড়লেন। হাতখানা ভ্রূর উপর বুলিয়ে নিলেন, ইস্, কি সরু হয়ে গেছে ওঁর হাত। আমার বড় দুশ্চিন্তাই হোলো। উনি তো কখনোও মোটা ছিলেন না, এখন যেন ক্ষয়ে যাচ্ছেন, হাত ওর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। আমি ওঁর কাছে ঘেঁসে বসলাম। "ছেলে মানুষ কিনা," মা বললেন, "তাই ওকথা ব'লছো। তা হয় না। যখনই কোনো মেয়ে পুরুষের হৃদয় জয় করে, পুরুষ নিজেকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে, সে অন্ধ হয়ে যায়। তোমার বাবা তো একজন জ্ঞানী, তিনিও রূপমুগ্ধ হ'লে যুক্তিতর্ক মানতে চান না। বাড়িতে তিনটি উপপত্নী ছাড়া আরো যে কত নাচওয়ালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। পিকিঙের নাচওয়ালী তো আসছিলেন লা-মের জায়গায়। বোধহয়, তোমার বাবার খেয়াল মিটেছে, তাই এলো না। বাপ যখন এমনি ধারা, ছেলের কাছ থেকে আর কত আশা করা যায়?"

"পুরুষ!" ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট কুচকে গেল তিনি যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। "জীবন্ত নারীর গায়ে সাপের মত লেপটে থাকাই তার স্বভাব।"

ওঁর স্বর শুনে ভয় পেয়ে গেলাম, শিউরিয়ে উঠলাম। বাবা ও তাঁর উপপত্নীদের বিরুদ্ধে এমন কথা মার মুখ থেকে কোনোদিন আর শুনি নি। আমি যেন তাঁর অন্তরের অন্তরে দেখতে পেলাম। তিক্ততা আর দুঃখের আগুনে বুক ভরে আছে। সেখানে উৎসারিত হচ্ছে লাভা প্রবাহ। তাঁর বুকের জ্বালা পুঞ্জিভূত বিদ্বেষকে টেনে বার করছে। সান্ত্বনার ভাষা কোথায়? আমার স্বামী যদি·· না, ভাবতে পারলাম না। তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, খোকা তখনো তরমুজের বীচি নিয়ে খেলা করছে। ছিঃ, কি ছোটই হয়ে যাচ্ছি। এমনি অলক্ষুণে সন্দেহ মনেও আসে। কিন্তু মাকে কি করে সান্ত্বনা দেব।

তবু মাকে বললাম, "বিদেশী মেয়েটি হয়তো—

মা আমাকে ভরতে-ভরতে বাধা দিয়ে বললেন, "তার সম্বন্ধে কিছুই বলবো না। ছেলেকে আসতে লিখেছি, ফিরে এসে লীর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর-কন্না করুক, বংশের গৌরব রক্ষা হোক। তারপর রক্ষিতা হিসেবে তাকে রাখুক না! বাপের বেটা তো, কত আর ভাল হবে! যাও, আমি এখন ঘুমোব।"

মার শরীর জীর্ণ হয়ে এসেছে! পাতের মত লেগে আছেন বিছানায়। না, বিরক্ত করে দরকার নেই। খোকাকে কোলে করে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি এসে স্বামীকে বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। ওঁর দুঃখে

সান্ত্বনা দিতে পারি না। উনি হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, "ছিঃ, কেঁদো না! দাদা ফিরে আসবে।"

ক্ষীণ আশা হলো। স্বামীর কথায় আশা তো হবেই। উনি যে অনেক কিছু জানেন। কিন্তু পরদিন স্বামী যখন কাজে বেরিয়ে গেলেন, নিঃসঙ্গ বাড়িতে বসে আবার কাঁদলাম। আমার মনে জুড়ে বসল সন্দেহ।

মার কথাই ভুলতে পারছিলাম না। কতো আশা করে, কতো দুঃখ কষ্ট সয়ে তিনি দাদাকে পালন করেছিলেন। বুড়ো বয়সে সেই তাঁকে কাঁদাল। সন্তানের মুখ চেয়ে মানুষ ভবিষ্যতের জাল বোনে, আর সেই সন্তান এমনি করে কাঁদায়। মার প্রতি কর্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্তব্যকে সে তার তুচ্ছ কামনার জন্যে জলাঞ্জলি দিলে। সে না মার একমাত্র ছেলে! ভগবান করুন, দাদা ফিরুক! ঝগড়া করবো। কেমন করে সে বিদেশী পেত্নীকে বিয়ে করবে, তার ছেলেকে মার কোলে বসাবে?

দাদা ফিরুক! ঝগড়ার জন্য কোমর বেঁধেই আছি।

[দুই]

বোন,

কোন খবর নেই! পনেরো দিন ধরে মালীকে পাঠাচ্ছি মার ওখানে। রোজ এসে বলছে, মা বললেন, তাঁর কোন অসুখ হয় নি। ঝি-চাকররা বলেছে, তিনি ঘর থেকে বেরোন নি' কদিন, তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন! খান না দান না। দাদারও কোনো খবর নেই। তার জন্যেই তো মার এমন দশা। এ বয়সে কি অতো দুঃখ সয়!

দাদাই বা চিঠি লিখছেনা কেন? নিজের হাতে তৈরি করে খাবার পাঠাই রোজ। চিনে মাটির সুন্দর পাত্রে খাবার যায়। লিখে দিই, মা, এই খাবার খাবেন। জানি ভাল হয়নি, কিন্তু মেয়ের হাতের তৈরী খাবার আশা করি ফেলে দেবেন না। চাকর এসে বলে উনি খেয়েছেন। তবে এখনও নাকি কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না। দাদার কথাই ভাবেন বোধ হয়। দাদাটা কি নির্লজ্জ! কর্তব্য ভুলে গেছে। মাকে মেরেই ফেলবে নাকি! সে কি জানে না, ওসব পশ্চিমি ধারা এখানে চলে না! তার রয়েছে কত কর্তব্য!

ভেবে-ভেবে ঠিকই করতে পারলাম না, দাদার মতলবখানা কি? মার প্রতি কর্তব্য নেই! এত বড়টা হলেন কার দৌলতে? ওর ঐ শরীর, চামড়া, চুল—কার দান? ছেলেবেলায় না কণফ্যুসির বাণী শিখেছিলো: মানুষের প্রথম কর্তব্য, বাপ-মার আদেশ পালন। বিদেশী আবহাওয়ায় সব ভুলে গেছে। বাবাও শীগ্‌গিরই ফিরছেন, নিশ্চয়ই

তিনি ওকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবেন। আর ভেবেই বা কি করবো, মেয়ে-মানুষের তো কিছু করবার উপায় নেই!

ক'দিনই বা চুপ করে থাকা যায়! আবার অস্থির হয়ে উঠলাম। মন যেন অশান্ত, উদ্দাম নদীর ধারা। বার বার নিজের বালুগর্ভে আছড়ে পড়ছে।

বোন, সাবেক আমলের জীবনধারা সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ এনে দিলেন মনে আমার স্বামী। তিনি আমাকে ভালবাসেন, সেই ভালবাসার দাবীতেই আমার মনে সংশয়ের বীজ বুনলেন। কাল রাতে অদ্ভুত সব কথাই তিনি বললেন। তোমাকে বলছি বোন। কি ব্যাপার হোলো শোনো।

রাতে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝি চাকর কাজ সেরে চলে গেছে। চারদিক নিরালা, নিঝুম। স্বামীর পাশে দালানে বসেছিলাম। চাঁদ উঠেছে আকাশে, মিঠে বাতাস বইছে। সাদা মেঘের মিছিল একঝাঁক বরফে মোড়া সাদা পাখীর মত মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে! চাঁদের স্বচ্ছ মুখখানা এই ঢেকে যাচ্ছে, এই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মেঘগুলির গতি এত হালকা, এত তাড়াতাড়ি চলে, মনে হয় যেন চাঁদ ঘুরছে গাছের শিয়রে। লাট্টুর মতো ঘুরছে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট। এমন রাতে কার না মন খুশিতে ভরে ওঠে! আমার মনও সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। জীবনে আমি সুখী, সুখী। চোখ তুলে চেয়ে দেখি স্বামী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কি এক ঘন আনন্দে দুলে দুলে উঠলো বুকে। কেমন লজ্জাও হোলো। স্বামী আমার হঠাৎ-খুশি লক্ষ্য করে বললেন, "চমৎকার রাত! বীণাটা এনে একটু বাজাও না।"

ভর্ৎসনার ছলে বললাম, "বীণা আর গানের তো এ রাত নয়। শাস্ত্রকাররা বলেন: বীণার বিধি নিষেধ আছে। ছ'টি তার বর্জনীয় ব্যাপার, সাতটি নিষেধ। শোকে আকুল হ'লে বীণা বাজিয়ো না।

যখন আনন্দের বাজনা বেজে উঠবে, তখন বীণার ঝঙ্কার তুলো না। বাদক যখন নিরানন্দ, যখন তার দেহ কলঙ্কে মলিন, যখন ধূপ জ্বলছে না ঘরে, যখন শ্রোতা অরসিক—তখনো নয় বীণার সুর। বীণার ঝঙ্কার তুলতে হলে চাই শান্ত, প্রফুল্ল মন, চাই একজন রসবোদ্ধা।" আজ যদি বীণায় না ঝঙ্কার ওঠে, শাস্ত্রাকারের কোন্ নিষেধ হুঙ্কার দিয়ে উঠবে।

"আজ তো আর আমাকে অরসিক তুমি বলতে পার না। কিউ-ই-লান," তিনি বললেন, "বাজাও, বীণা বাজাও, লক্ষ্মীটি!"

বীণা নিয়ে এলাম। ওর পাশে পাথরের টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখলাম। কী গান গাইব? অনেক ভেবে গাইলাম:—

কন্‌কনে হৈমন্তী-হাওয়া,
বিশীর্ণ, অনুজ্জ্বল চাঁদ আকাশে।
ঝরা পাতার মর্মর শুনি।
তুষার-তাড়িত কালো কাকটা
জীর্ণ পাতার আড়ালে আশ্রয় খোঁজে,
মেলে না তো,– তাই ওর বুকে উদ্বেলিত নিরাশা।
প্রিয়, এমন রাতে তুমি কোথায়?
মন্দিরে বিরহিনী—রাতের তিমির
পুঞ্জীভূত তার বুকে। তুমি
কোথায়? আর কি দেখা হবে?
আজ রাতে তো কাঁদছি শূন্য মন্দিরে।

গান থেমে গেল। রক্তাক্ত একটা পাখীর মত গানের শেষ কলি নিরাশার দীর্ঘ রেশ নিয়ে যেন মাথা খুঁড়ে মরছিল। একা! একা!—অনুরণিত হয়ে উঠলো আকাশে বাতাসে। সৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে

পৃথিবী থেকে। এক অনির্বচনীয় দুঃখ ঘনিয়ে এলো মনে। মার সে দুঃখ। চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। বীণার তারে হাত দিয়ে থামাতে চাইলাম সে সুরের রেশ। সে তো থামে না, রনুরনিয়ে ওঠে ……তাঁকে বললাম, স্বামী, আজ অরসিক তো আমি। দুঃখভরা মন নিয়ে বীণা বাজাতে বসেছি। শাস্ত্রকারের নিষেধ তো মানি নি। তাই তো বীণার দুঃখের সুর থেমেও থামতে চায় না। উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এত দুঃখ কেন, আমাকে বলবে কি?"

এলিয়ে পড়লাম তাঁর কোলে, বললাম "আমার মার জন্যে এ দুঃখ। মার ব্যথা বীণায় ধরা দিয়েছে। আজ রাতে বুঝি তিনি এই বীণার ঝঙ্কারের মতোই আকুল হয়ে উঠেছেন। সব কিছুই আজ প্রতীক্ষায় আকুল। আসবে, দাদা আসবে। মার তো আর কেউ নেই। আমিও তো এখন তাঁর পর। দাদার কি হবে?

স্বামী উত্তর দিলেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "সত্যি কথা শোনাই ভাল, সে মার কথা শুনবে না।"

"আপনি কেন অমন মন্দ ভাবছেন?"—ভীত হলাম।

"না ভাববার কারণ কি, বল?"

ওঁর কাছ থেকে দূরে সরে এলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

"আমি জানি না" তিনি মুখ থেকে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন। আমি শুধু এইটুকু জানি যে বাবা-মার প্রতি, বংশের প্রতি কর্তব্য করবে।—কেঁদে ফেললাম।

"কর্তব্যের ওজর আগের দিলে চলত, আজ অচল পুরানো দিনের প্রাকার ভেঙে পড়ছে। আজকাল অন্য যুক্তি দেখাতে হবে। আর তুমি,"—উনি বললেন। "যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার, বিদেশিনীকে বিবাহ করবার নিষেধ কেন?

ওঁর কথা শুনে মনে তো নানা কথা এল। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম,

"বিদেশী পেত্নীকে বিয়ে করবার যুক্তিই বা কি?" স্বামীর কাছে বলতে ভয় হলো, খোকা হওয়ার আগে দেখে এসেছি তো! সাদা চোখো পেত্নী সব! চুলের রং কাল নয়, হাত পা মরদদের মতো! দাদাটা বাবার ছেলে হয়ে কিনা সৌন্দর্যবোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে!

স্বামী হেসে বললেন, "বিদেশীদের নাম করতে গেলেই তুমি ভূত আর পেত্নী ব্যবহার কর। সব চীনে যেমন সুন্দর নয়, সব বিদেশী তেমনি কুৎসিত নয়। তোমার দাদার বাগদত্তা স্ত্রী লীর মেয়ে তো শুনেছি কদাকার! বাজারে চাখানায় লোকেরা তো বলাবলি করে তার ঠোঁট দুটো নাকি যেমন পুরু, তেমনি মস্ত হাঁ!"

"তাদের কি স্পর্ধা!" চীৎকার করে উঠলাম, "একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে সাহসী হয়!"

"যা শুনেছি", স্বামী বললেন, "তাই বললাম। হয়তো এ সব শুনেই তোমার দাদার মন বিগড়ে গিছলো, তাই অন্য মেয়ের দিকে তার নজর গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, "পাশ্চাত্যে এমন মেয়ে দেখেছি, যারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই সুন্দর, শান্ত! তাদের চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট, সুন্দর সুঠাম দেহ…!"

চোখ ঠেলে কপালে উঠলো! স্বামীর মুখেও ঐ কথা!

স্বামী বলে চললেন, "সূর্য আর বাতাসের মতই তারা মুক্ত, উদার! কি সুন্দর তাদের নগ্ন, সুডৌল বাহু! গহনার ভারে চীনে মেয়েদের মত ভারী করে রাখে নি। ওদের নেই নকল শালীনতা বোধ, নেই কৃত্রিম লজ্জা। নাচতে-নাচতে তারা চলে, হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। পুরুষের মন কেড়ে নেয়, আবার ভুলতেও পারে অতি সহজে। যেন ফুল তোলার মতোই। এই ফুল ছিঁড়ে নিলে, আবার ফেলে দিলে অবহেলায়। সূর্যের আলো যেমন স্থির হয়ে থাকে না, তেমনি ওদের মন ”

বুকের ধুকধুকানি যেন থেমে গেল। কার কথা বলছেন অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে? কোন্ বিদেশিনীর মায়া কাজল চোখে এঁকেছেন? রাগে দুঃখে বললাম, “আপনিও?”

মৃদু হেসে বললেন, “পাগল! আমার হৃদয় তুমি ছাড়া কে জয় করবে?” আর সে কি এত সস্তা যে কোনো বিদেশিনীকে তা নষ্ট করতে দেব! আমি বিদেশে হৃদয়খানাকে আড়াল করে রেখে ছিলাম। তার স্বর কোমল হয়ে এল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম।

“বাবাঃ! যা পাথরের মত কঠিন।”—আঘাত করলাম।

“হাঁ”, তিনি হাসলেন। “চীনেরা সবাই তাই। তাই তারা একত্র কেমন আলাদা। আমাদের মেয়েরা তো ভীরু, স্বল্পভাষী। ওরা মনের কথা প্রকাশ করতে জানে না তাই বিদেশী মেয়েদের দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। সুন্দর, রাজহাঁসের মতো সাদা রং তাদের। সুঠাম সুন্দর দেহ নিয়ে তারা যখন নাচের সঙ্গিনী হবার আহ্বান জানায় তখন তো বোঝা যায় না। তোমার দাদা তাদের দেখে মুগ্ধ হবে, আশ্চর্য কি?”

জন্মগত সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো! বললাম, “দেবতার দোহাই, ওদের অসভ্যতার পরিচয় আর দেবেন না! ওদের জাতটাই কি অমনি?”

“না”, স্বামী বললেন, এ অসভ্যতা নয়, এ বলিষ্ঠ তরুণ মনের পরিচয়। তোমার দাদাও তরুণ, তাই বলছি। কিন্তু বিদেশীর এই উদ্দামতার সবটুকুই ভাল নয়। তারা নতুন জাতি, এখনো তেমন

মার্জ্জিত হয়ে ওঠেনি তাদের রুচি। উদ্দামতাকেই সবকিছুর শেষ বলে ধরে নিয়েছে। তাই তরুণদের মন তারা বেশি করেই টানে। কিন্তু নীর মেজো মেয়ের পুরু ঠোঁটের উপায় কি হবে? সে তো নাকি ধান-কাটা কাস্তের মতোই বাঁকানো।"

স্বামী জ্ঞানী। ওঁর কথা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন তো বুঝতে পারি, বোন, তোমাদের নাচে গানে, পোষাকে একটা নেশা আছে। উলঙ্গ দেহের আকর্ষণ তো থাকবেই। তখন কিন্তু মনে পড়ছিল, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে লা-মের অশ্লীল হাসি! কিছুতেই সে কথা মন থেকে দূর হতে চায় নি।

ভাবনাও তো অফুরন্ত। দাদা পুরুষ মানুষ। আর চিঠিপত্রও আসেনি। এ তো অমঙ্গলেরই চিহ্ন। ছোটবেলা থেকে ও কিছু করবার জিদ ধরলে কেমন চুপ করে যায়। ও যখন একেবারে ছোট, মা কোনো কিছু করতে বারণ করলে, ও হঠাৎ চুপ করে যেত। তারপর ঠিক সেইটেই করে বসতো। এবারও কি তাই হবে নাকি!

সেদিন আর বীণা বাজানো হলো না। আকাশে চাঁদ-তারার দল মেঘে ঢেকে গেল। বৃষ্টির ছাট লাগছিল গায়। বদলে গেল রাতের রূপ। স্বামী আর আমি ঘরে চলে এলাম। কিন্তু ভাল ঘুম হোল না সে রাতে।

[তিন]

ভোর হলো, আকাশের রঙ ফেরে নি, বাতাস ভিজে। ধূসর আকাশে মেঘের আনাগোনা। গুমোট হয়ে আছে। খোকা কাঁদছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। না, জ্বর হয় নি।

মালী ভোরে খবর নিয়ে এলো, বাবা ফিরেছেন। দু'দিন থাকবেন, শুনলাম। ওয়াঙ-ডা-মা নাকি পেশাদার লিখিয়েকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। বুড়ির সাহস আছে। আর সে লিখেছিল, মার শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে, তিনি খান না, দান না। বাবা সেই চিঠি পেয়ে এসেছেন।

খোকনকে লাল পোশাক পরিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চললাম। গিয়ে দেখি, বাবা পুকুর পাড়ে বসে লাল মাছের খেলা দেখছেন। গরম দিন; গায়ে তাই ফতুয়া, পরনে সিল্কের পায়জামা—উইলো গাছের ছায়া পড়লে পুকুরের জলের যেমন রং হয়, তেমনি রং পায়জামার। দ্বিতীয়া উপপত্নী পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে। একটু নড়ে বসতে তার কষ্ট হয়। তাই পাখা করতে গিয়ে নিজেই গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। তার ছেলে বাবার কোলে হাঁটুর উপর বসে। আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে, আমার ছোট মা তার ছেলে নিয়ে হাজির।"

হাঁটু থেকে দ্বিতীয়া উপপত্নীর ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে খোকনকে তুলে নিয়ে আনন্দে বললেন, "নাতি, আমার নাতি। ওরে মিষ্টি নিয়ে আয়—চিনির রসে ভিজানো খেজুর আর চর্বির পিঠে।"

ভয় পেয়ে বললাম, "বাবা, খোকন নরম জিনিস ছাড়া খায় না।"

আমি তাঁকে এবার প্রণাম করলাম।

বাবা ইসারায় চুপ করতে বলে খোকাকে আদর করতে লাগলেন, "ছোট্ট মানুষটি, তোমার মা-টা বড্ড ভীতু। নরম জিনিস খাইয়ে রেখেছে? খোকাটা জানে না, আমারও তোমার মত অনেক ছেলে আছে।" আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মা, তোমার দাদা যদি এমনি একটি ছেলে আমাকে দিত!"

দাদার কথা উঠতেই সাহস করে বললাম, "দাদা বিদেশী বিয়ে করবে শুনে মা মুষড়ে পড়েছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা তো দেখেছেন।

"না", বাবা বললেন, "তা হবেনা! আমার অনুমতি ছাড়া সে বিয়ে করতে পারবে না। আইনত সে তা পারে না। চব্বিশ বছর বয়সে রক্ত অমন একটু-আধটু চঞ্চল হয়ই। তোমার মা শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আজ ভোরে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। ও কিছু নয়। ওর মত বয়সে তিন-তিনটে নাচওয়ালীকে ভালোবেসে ছিলাম। তা' ফূর্তি করুক, দু'চার মাসেই হাঁপিয়ে উঠবে। বিয়ে কিছুতেই করবে না। বিদেশে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আর বিদেশী মেয়েরা যতই খারাপ দেখতে হোক, তারা মেয়ে তো বটেই। তাদের আকর্ষণ তো থাকবেই। কিন্তু তাই বলে বিয়ে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "তোমার মা এত বুদ্ধিমতী, টাকা-কড়ির হিসেব রাখেন, সংসার চালান; কোনোদিন আমার দোষ খোঁজেন নি। তবে চিরদিনই গম্ভীর। প্রথম প্রথম তো কেমন লাগতো। তা মেয়েদের মন কে জানে বল। আজকাল দেখেছ, কেমন যেন হ'য়ে গেছেন। আরো গম্ভীর। কেবল বলছেন, ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে।"

মেজ উপপত্নীর হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে নিজেই হাওয়া খেতে

লাগলেন। খোকাকেও কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। যেন সব ভুলে গেছেন। এবার তিনি রাগে ফেটে পড়লেন, তোমার মা এক-এক-সময়ে এক-একটা কল্পনা নিয়ে কাটান। সেইটেই তখনকার মতো তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। এখন তার মাথায় এক উদ্ভট কল্পনা গজিয়েছে যে, তোমার দাদার বিয়ের পর প্রথম ছেলে হবে, আর সে ছেলে হবে, অসামান্য এক প্রতিভা। উঃ মেয়েরা কি রকম হয়! তারা অন্দরে বন্ধ থাকে বলে পৃথিবীর কিছুই জানে না।

তিনি চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগলেন। এবার তাঁর মুখ থেকে রাগের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে খোকাকে আবার কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে এক-টুকরো কেক গুঁজে দিয়ে বললেন, "খাও তো যাদু আমার।" আমার দিকে চেয়ে বললেন: "কেন যে তোমার মা কেঁদে কেটে অনর্থ কর্চ্ছেন, বুঝতে পারি না। আমার আদেশের অবাধ্য হবে, এমন ছেলে তোমার দাদা নয়।"

সন্তুষ্ট হ'লাম না কিন্তু। বললাম, "যদি বাগদত্তাকে বিয়ে করতে রাজি না হয়? আজকাল তো এমন ব্যাপার হামেশা ঘটছে।

বাবা মৃদু হেসে বললেন: "পাগলী! তাও কি কখনও হয়? এক বছর পরে লীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। দেখবে বছর ঘুরতেই ছেলে হয়েছে।" খুশি হ'য়ে খোকার গাল টিপে দিলেন।

স্বামীকে বাবার কথা বললাম। তিনি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ওরা রক্ষিতা হতে চাইবে না। ওদের দেশে এ রীতি প্রচলিত নয়।"

দাদাকে পেয়েছে এইতো যথেষ্ট, রীতি মানবেনা? সে কি আশা

করে, দাদার একমাত্র স্ত্রী হ'য়ে সংসার করবে ? মনে মনে চটলাম। মা যা বাবার কাঁছে আশা করেন নি, চাইলেও পে'তেন কি সন্দেহ, বিদেশী পেত্নীটা তাই চাইবে !

বললাম, "না, এ বিয়ে অসম্ভব। বিদেশী হাওয়ায় আমাদের পবিত্র বংশকে অপবিত্র করতে সে পারবে না। আর বিয়ে করলেও তাকে আমাদের রীতি মেনে নিতে হবে। আমার মা যা দাবী করেন নি, সে দাদার কাছ থেকে তা দাবী করবে ? ওসব বিদেশী রীতি এখানে চলবে না !

আচ্ছা, স্বামী বললেন, "আমি যদি বলি একটি উপপত্নী রাখবো, তুমি খুশি হবে ?"

ভয়ে বুকখানা হিম হয়ে গেল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম : "না, না। আমি তো আমার কর্তব্য করেছি। আমার অপরাধ ?"

আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভয় পেওনা, কিউ-ই-লান, চীনের এ বর্বর রীতি আমি মানি না। আমি পারব না, করব না"—

আশ্বস্ত হলাম। এমন কথা সব স্ত্রীই শুনতে চায়, আশা-আশঙ্কায় দুলে ওঠে বার বার তাদের মন। কিন্তু এমনি সুর কি তার ? আছে কি এমন সত্য। সে তো ছলনায় ভরা। স্বামী আমাকে ভালবাসেন, তাই সত্য বেজে উঠলো। তাঁর সুরে, স্বামীর সোহাগ যারা পায়নি তাদের ব্যথা, মার ব্যথা—অতীতের নারীদের ব্যথার বন্যা বয়ে গেল।

স্বামী শান্ত করলেন, সে-কথা তোমাকে বলতে পারব না ! লজ্জা করছে, নিজেই ভেবে লজ্জায় মরে যাই। তবে একটা কথা বলতে পারি, ভালবাসা বুলি আর কোনো কথায় এমন করে রূপ পায়নি। আমার কান্না অমনি থেমে গেল শান্ত হলাম। সে কি শান্তি বোন !

"কাঁদছ কেন ?"—জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নিচু করে রইলাম। রক্তের ঢেউ যেন সারা মুখে ছেয়ে গেল। মুখখানা ছু'হাতে তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করলেন: "বল, কাঁদছ কেন?"

সত্যি কথাই বললাম, "আপনি আমার স্বামী, আপনার ভালোবাসা তো আমার চক্ষুদান করেছে। তাই ভাবছিলাম, ভালবাসায় যারা ব্যর্থ হয় তারা কি হতভাগী!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: "সেই বিদেশী মেয়েটি সেও যদি তোমার দাদাকে ঠিক তোমার মত ভালোবেসে থাকে? সাগর পারে জন্মেছে বলে তার স্বভাব তো বদলায় নি। সে নারী। তোমার মতই তার কামনা, তার ভালোবাসা।"

এমন করে কখনও ভাবতে শিখি নি তো? এতটা তো খতিয়ে দেখিনি। স্বামী, গুরু আমার, আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন, আমাকে শেখালেন। সত্যিই ভয় করছে, বড় ভয়। বুঝতে পারছি গো। মেয়েটি যদি আমার মতই দাদাকে ভালোবাসে, কী উপায় হবে?

[চার]

দাদার কাছ থেকে চিঠি এসেছে। স্বামী আর আমার সাহায্য চেয়ে লিখেছে, আমরা যাতে বাবা-মাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পারি। তারপর করেছে, বিদেশী প্রেমিকার রূপবর্ণনা। কি জোরালো ভাষা, প্রতিটি কথা যেন বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি! একটি উপমা মনে পড়ছে: তার প্রেমিকা যেন বরফ-ঢাকা পাইনের মত দেখতে।

বিদেশী প্রথায় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, সে খবরও জানিয়েছে। মার চিঠি পেয়েছে, এবার বিদেশী বৌ নিয়ে দেশে ফিরবে। আমরা যেন তাদের প্রেমের পথ সুগম করে দেবার চেষ্টা করি। তারা ভাল-বেসেছে, তারই দোহাই দিয়ে লিখেছে আমাদের কাছে। তাদের ভালোবাসার দাবী।

কি করবো বোন বল তো। স্বামী আর আমার মধ্যে আজকে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাতে তো এ দাবী তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমি তো এখন ভুলে গেছি মার সেই উত্তেজনা, দুঃখ, দাদা যে মার অবাধ্য হয়েছে সে কথাও মুছে গেছে মন থেকে। দাদা আমাকে টেনে নিয়েছে ওর দলে। না—দাদা তো নয়—এ আমার প্রেম।

প্রেম! তার মর্ম তো ভালো করে বুঝতে পেরেছি। দুঃসাধ্য হলেও দাদার অনুরোধ রাখতে চেষ্টা করবো।

আগে তো মার কাছে যাই।

তিন দিন হলো মার কাছে গিয়েছিলাম, বোন। দাদার হয়ে অনেক কথাই তো বললাম। আগে থেকেই তৈরী হয়ে গিছলাম। বর যেমন করে বেছে বেছে কনের জন্য গহনা কেনে, তেমনি করে

বাছা বাছা কথাই বললাম। কত কাকুতি মিনতি করলাম কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো না, বরং রাগই করলেন-বুঝি! আমি যে দাদা আর বিদেশীর পক্ষ হয়ে বলতে এসেছি এর জন্যে তিনি আমাকে দোষী করলেন। কিন্তু কিছু বললেন না মুখ ফুটে। কিন্তু জানি তো তাঁকে। তিনি আমার কথায় কানই দিলেন না। আমিই বা বলতে পারলাম কই? কথা তো সাজিয়ে গুছিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু তা বলা হোল না। কি বলতাম মাকে জানো? বলতাম: তাঁর নিজের বিয়ের কথা, বাবার ভালোবাসা—এসব স্মরণ করে যদি তিনি ক্ষমা করেন দাদাকে।

কিন্তু প্রেমকে ভাষার গণ্ডীতে বন্দী করা যায় কখনো? কে কবে শুনেছে সোনালী মেঘ লোহার পাত্রে ধরা দিয়েছে। এ যেন প্রজাপতিকে বাঁশের তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে। তবু যাহোক করে জোড়া-তালি দিয়ে প্রেমের মহিমা কীর্তন করলাম: প্রেম বন্ধন মানে না, রীতিনীতি মানে না। দাদা ও বিদেশিনী সেই প্রেমের কাছেই পাঠ নিয়েছে। ইস্, লজ্জায় ঘেমে উঠছিলাম! মার কাছে কখনও ওসব কথা বলা যায়?

মা কিন্তু আমার নজীর উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন: "স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ভিতর কবিত্ব নেই, আছে কামনা! পুরুষ চায় স্ত্রীর সংসর্গ, স্ত্রী চায় সন্তান। দু'পক্ষের কামনা পূর্ণ হলেই সব শেষ হয়ে গেল।"

ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম: "আপনার বিয়ের দিন স্মরণ করুন। মন কি আনন্দে নেচে ওঠে নি?" সেদিন কি শুধু কামনাই ছিল? ভালবাসা কি জাগেনি?

আমার ঠোঁটে আঙুলের আঘাত করে বললেন: "চুপ! ওঁর কথা তুলো না। হাজারটা মেয়ে ওঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। একজনের প্রেম নিয়ে কি করবেন? ওঁর আত্মা একজনের জন্যে তো উন্মুক্ত হয়ে থাকতে পারে না!"

তাঁর হাতখানার ওপর আলতো একটু চাপ দিয়ে বললাম: "কিন্তু

আপনার মনে ?" হাতখানা আমার হাতের উপর কাঁপছে, এবার উনি তুলে নিলেন।

"না, এ বুক শূন্য। প্রেম ছিল না, ছিল সন্তানের কামনা। সে কামনা আজো আছে। তোমার দাদার ছেলে যেদিন পিতৃপুরুষের স্মৃতি-মন্দিরে প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করবে—সেইদিন হবে তার নিবৃত্তি। আমি শান্তিতে মরব।"

আর কিছু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতে হলো।

মার কাছ থেকে কতদূরে চলে গেছি, তাই ভাবি। দুজনে কেঁদে উঠি, কিন্তু একে অপরের কান্না তো শুনতে পাই না, তাই ফুটে ওঠে না সমবেদনার সুর। আমরা দুজনে কথা বলি, কিন্তু সে কথায় তো দুজনের বোঝাপড়া হয় না। পরস্পর পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে যাই। কেন এমন হোলো ? হাঁ, হাঁ, জানি। আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমার, আর এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে প্রেম।

ভঙ্গুর সেতুর মতো বর্তমান আর অতীতের মাঝখানে দুলছিলাম। মা, মূর্তিমতী অতীত—তাঁকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে দেখি,—স্বামী হাত বাড়িয়ে আছেন। তিনি মূর্তিমান বর্তমান। স্বামীকে তো আর অপমান করতে পারি না ? প্রেমকে তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।

ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে।

দিনগুলি একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেদিন স্বপ্ন দেখলাম, নীল সাগর, আর তার বুকে সাদা জাহাজ পাখীর মত উড়তে-উড়তে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। যদি পারতাম, হাত বাড়িয়ে তার গতিরোধ করতাম ! মাঝ সাগরে স্তব্ধ হয়ে যেত জাহাজ। আর কূলে আসতে

পেত না। দাদার সুখী হওয়ার কোনো আশাই নেই। বাপের ভিটায় তো তার ঠাঁই হবে না।

কিন্তু আমার এই দুর্বল হাত দুখানি দিয়ে কিছুই তো রোধ করা যায় না। শুধু স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখতে পারি, কিছুই তো ভাববার শক্তি নেই। কি অশান্তি বোন! শুধু খোকনের মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। তাইতো খোকাকে আজকাল আর চোখের আড়াল করি না। কিন্তু রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কানে বাজে সমুদ্রের গর্জন। জাহাজ এগোচ্ছে, কি করে তাঁর গতি রুখবো?

বোন, দাদা বৌ নিয়ে এলে কি উপায় হবে। সব ছন্দ কেটে যাবে জীবনের, অদ্ভুত জটিল হয়ে উঠবে পরিবেশ। কি করবো, চুপ করে আছি। জানি না, কি হবে। শুধু দাদার অপেক্ষায়ই দিন কাটছে।

স্বামী কাল বললেন, আর সাতদিন পরে জাহাজ শহরের উত্তর দিকে সমুদ্রের মোহনায় ভিড়বে। স্বামী তো আর জানেন না, এই অষ্টম দিনটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার মন কত ব্যাকুল। ভবিষ্যতের দূর গর্ভে সে তলিয়ে যাক্ না, সে যেন কাছে না আসে। কিন্তু ওঁকে বলতে তো পারি না।

উনি পুরুষ, উনি কি আর মার দুঃখ বুঝবেন? আমিও তো আর মার কাছে যাই নি। দেখা করবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। শুধু ভুলতে পারি না, মা একা, বড একা! দাদা ফিরে আসবে, সেই তো এখন তাঁর ভয়।

দাদা আর তার বিদেশী বৌয়ের কথাও কি ছাই ভুলতে পারি! ওরা ভালবেসেছে যে! আমি যেন একটা ক্ষীণ খেজুর গাছ, জোরালো হাওয়ায় এলিয়ে পড়ছি, ছিঁড়ে।

[পাঁচ]

বোন,

তোমার ছুটি কখন হবে, তার জন্যে বসে থাকতে পারবো না! পায় দলে এসেছি। ঝির কোলে খোকনকে যখন রেখে আসি, কি চিৎকারই করছিল। না, না, চা থাক। আমাকে এক্ষুনি বাড়ী ফিরতে হবে।

শুধু খবর দিতে এলাম, তারা এসেছে—আমার দাদা আর তার বৌ, এইতো দু'ঘণ্টা আগে এসে পৌছেছে। আমাদের ওখানেই উঠেছে। ওকে চোখ ভরে দেখলাম। শুনলাম ওর কথা। খেতে বসে তড়বড় করে কত কথা বলে গেল, বুঝতে পারলাম না। কি চেহারা, কি পোশাক সবই অদ্ভুত। কিন্তু তবু তো চোখ বার বার ওর মুখের উপর গিয়েই পড়েছে।

সবে ছোট হাজিরীতে বসেছি, এমনি সময় তারা এলো। দারোয়ান খবর দিল: এক ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গীটি মেয়ে না পুরুষ বোঝা যায় না; —লম্বা পুরুষের মতো, মুখখানি মেয়েলি!

স্বামী ভাতের কাঠি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তারা এসেছে।"

তিনি দৌড়ে গিয়ে ওদের নিয়ে এলেন।

অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু মেয়েটির লম্বা চেহারা দেখে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। দাদার সঙ্গে কথা বলবো কি? দেখছিলাম তার বৌকে—কী লম্বা, দেহখানা লতার মতো ক্ষীণ; পরনে ঘন নীল পোশাক! হাঁটু অবধি নেমে গেছে পোশাক।

উনি কিন্তু অবাক হন নি। একটু বিব্রতও না। ওদের বসতে বলে চা আর ভাত আনতে হুকুম দিলেন। আমি কি বলবো? বৌকে দেখছিলাম।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম, আমাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে? এ বৌ নিয়ে কি করবো গো? এখনো এই কথাই ভাবছি।

দাদা যে তাকে ভালবাসে একথা ভুলে যাই বোন। ওর মুখ দেখে অবাক লাগে। মনে হয়, সে যেন স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে—স্বপ্নেও যাকে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয়।

কেমন দেখতে, জানতে চাইছ বোন? কি জানি, এসেছে পযন্ত একবারও ওর মুখ থেকে চোখ ফেরাই নি, তবু যেন ছাই কথা খুঁজে পাচ্ছি না! মনে করতে দাও, কেমন দেখতে?

হাঁ, হয়েছে! দাদার চাইতে একটু লম্বাই হবে। চুল কানের পাশে কেয়ারী করা নয়, ঝুলে পড়েছে; তাও ছোট করে ছাঁটা, উড়ন্ত, চোখ দুটি খুব বড়। যেন ঝোড়ো মেঘে ভরা আকাশের নীচে সমুদ্র। মুখে হাসি নেই।

এই কি সুন্দর নাকি! কি পছন্দ দাদার! ভ্রূ দুটো কি ধ্যাবড়া। মেয়েদের ভ্রূ হবে প্রজাপতির দুখানা পাখার মতো। দাদাকে ওর পাশে কি ছোটোই লাগে! কিন্তু ওর বয়েস তো মাত্র বিশ বছর—দাদার চেয়ে চার বছরের ছোট।

দু'জনের মুখ ঢেকে ওদের হাত ক'খানা যদি পাশাপাশি রাখা যায়, দাদার হাত দু'খানাই মেয়েদের মতো ছোটো আর নরম মনে হবে। বৌ আমার হাত ধরতে কি কর্কশই মনে হলো তার হাত! ওর চওড়া হাত যেন চামড়া ঠেলে বেরিয়েছে। ওর হাতের কব্জিও বেশ মোটা। আমার দুনো হবে। স্বামীকে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওর হাত অমন শক্ত কেন? দাদা হেসে বললো, "টেনিস

খেলে হাতে কড়া পড়ে গেছে।" ওই কি একরকম খেলা—মেয়ে পুরুষে খেলে। হয়তো ঐ খেলার ভিতর দিয়ে আসে প্রেম। কিন্তু কি কথা গো! ওমা, হাতে কড়া পড়েছে খেলে! সবই অদ্ভুত বিদেশীদের! পা দু'খানিও দাদার চেয়ে ইঞ্চি দু'য়েক বড়ই হবে। কি লজ্জার কথা!

দাদাকে বিদেশী পোশাকে পর-পর লাগছিল। যৌবনের সৌন্দর্য এক ফোঁটাও নেই! কেমন রুক্ষ ভাব। সদাই যেন চঞ্চল। দুধার স্বভাবটি হারিয়ে বসে আছে। আঙুলে একটা আঙটি দেখলাম, তাও সাধারণ, পাথর বসানোও নয়।

বসবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত বিদেশী। পায়ের ওপর পা তুলে স্বামী আর তার বৌয়ের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কি বলছিল! কে বলবে কোনো বিদেশী নয়, আমার দাদা! সহজেই বেরিয়ে আসছিল কথা! ঠিক মুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে, এমনি শব্দ!

নাক, চোখ, মুখও বদলে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে নেই নম্রতা। নীচু হয়ে থাকতে চায় না। তারা নির্ভীক। আবার সেই চোখে পরেছে পরকলা—সোনা আর শেলের মিশিয়ে তৈরী তাতে ওকে বেশ ভারিক্কী বলে মনে হয়। শুধু বাঁকা ঠোঁটে এখনও সেই ছেলেমানুষী ভাব। এই দেখেই বোঝা যায়, ও আমার দাদা। মার ঠোঁটের আদল আসে, তেমনি পাতলা, পেলব—অভিমানে ফুলে ফুলে উঠত ছেলে-বেলায় ঐ ঠোঁট। দাদাকে চেনার একমাত্র উপায় ঐ।

বাড়ীতে দেখছি, সবাই বিদেশী—শুধু আমি আর খোকা ছাড়া! ওরা অদ্ভুত পোশাক পরেছে, তড়বড় করে অদ্ভুত ভাষায় আলাপ করছে। আমার স্বামীও ওদেরই দলে। কিন্তু আমি আর খোকন তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝবো কি, আমরা খাঁটি চীনা যে।

মা ওদের ঘরে না নেয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকবেন

শুনলাম। একথা শুনলে মা চটে যাবেন না? কি করবো, স্বামীর হুকুম! আর দাদাও তো আমার মার পেটের ভাই!

খেতে বসে বড় হাসি পেল। দাদার বৌ খোকার মতো করেও ভাতের কাঠি ধরতে পারে না! ওর স্বর কি মোটা! মেয়েদের স্বর হবে কত মৃদু—যেন ছোট্ট পাখী শরবনের ভিতর গান গাইছে। এ যেন পাকা ধানের ক্ষেতে থ্রাস পাখীর ডাক। স্বামী আর দাদার সঙ্গেই কথা বলছিল। আমি তো ও পোড়া কথা বুঝি না। আমার পানে তাকিয়ে হাসলো। হাসি তো নয় যেন এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে নদীর থম্‌থমে কালো বুকে। হাসতেই তো ওকে চিনতে পারলাম। কিন্তু তবু সংশয় তো যায় না। ও আমার বন্ধুত্ব চায় নাকি? মনে মনে বললাম, খোকনকে নিয়ে আসি, দেখি সই পাতাতে কত দেরী হয়?

খোকনকে লাল জামা, সবুজ পায়জামা, চেরী-আঁকা জুতো, জরীর কাজ-করা টুপি পরিয়ে নিয়ে এলাম। গলায় দুলছিল রূপোর হার। ঠিক যেন রাজপুত্তুরটি! খোকা ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

নমস্কার করতে বললাম, খোকা খুদে খুদে হাত দু'খানি জোড়া করলো।

আনন্দে বৌ যেন কেঁপে উঠলো! হাসিতে ভরে গেছে মুখ। ঘণ্টার রোল যেন বেজে উঠলো ওর স্বরে। তারপর কি যেন বলতে বলতে খোকাকে বুকে আঁকড়ে ধরে চুমোয়-চুমোয় মুখ চোখ ভরে দিল। টুপী খোকনের কোথায় ঠিকরে পড়ে গেছে। ন্যাড়া মাথাটা বেরিয়ে পড়ছে। বৌ এবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার মানে আমি জানি।

দাদার বিদেশী বৌ তো এমনি একটা সন্তান চায়! হেসে বললাম, "আজ থেকে আমরা সই।"

দাদা কেন যে ওকে ভালবাসে, এবার বুঝতে পারলাম।

পাঁচ দিন কেটে গেছে। এখনো তারা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে নি। দাদা আর উনি তো সারাদিন এই নিয়েই আলোচনা করেন। জানি না, কি ঠিক করছেন! বিদেশী ভাষায়ই তো আলাপ হয়। যাই হোক, তড়িঘড়ি করে কোনো কাজ হবে না। এটুকু বুঝি। আমি কিন্তু এদিকে বৌকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি।

আমাদের মেয়েদের মত নয় বৌ। চঞ্চল, লাজ-লজ্জার বালাই নেই। দেহের প্রতিটি ভঙ্গী স্বাধীন, শাসন মানে না, আর কেমন এক ছন্দ যেন দুলে দুলে ওঠে ওর চলাফেরায়। চীনা মেয়ের নম্রতা নেই, আছে এক পুরুষালি বলিষ্ঠ ভাব। দাদার দিকে চেয়ে থাকে! পুরুষদের কথা হাঁ করে শোনে, দরকার হলে বলেও। ঠিক লা-মে যেন!

লা-মের তবু ভয় বলে একটা পদার্থ ছিল, এর তাও নেই। তাই বলে লা-মের মত সুন্দরী নয়। সৌন্দর্য সে চায় না! নিজের পরিপূর্ণতায় উপচে পড়ছে। তার চোখ দুটি যেন বলছে: আমার স্বরূপ দেখ। সাজ-পোশাকে তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাই না। আমি, আমি। নকল জিনিসে আমাকে আড়াল করে রাখা চলে না।

ওর বোধ হয় বড় গর্ব। আমাদের পরিবারে যে কি অনর্থ নিয়ে এল, সেকথা বৌ বুঝি একটিবারও ভাবে না। নিজেকে নিয়েই ও মসগুল। সারাদিন বই পড়ছে, খোকনকে আদর করছে আর চিঠি লিখছে। বাক্স বাক্স বই এনেছে বৌ। আর চিঠির কথা যদি বল বোন। সেদিন তো উঁকি মেরে দেখলাম। কি সব কাগের ঠ্যাং

বগের ঠ্যাং। আমাদের মতো এমন সুন্দর হরফ নয়। কিছু বোঝাই যায় না। হাঁ, কি যেন বলছিলাম বোন? বৌ নিজেকে নিয়েই বিভোর। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সবাই গম্ভীর, ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাগানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। বুনতে তো একটিবার দেখলাম না। বিদেশীদের ধরণই আলাদা।

এক দিন দাদা আর বৌ সকালে বেরিয়ে গেল, ফিরলো সেই দুপুরে। ধুলোয় কাপড়-চোপড় মাখামাখি, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। আমি তো অবাক ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কোথায় গিয়েছিলো? খাওয়া নেই দাওয়া নেই!"

"হাইকিঙে বেরিয়েছিল।"—স্বামী বললেন।

"সে আবার কি?" আশ্চর্য হয়ে শুধোলাম।

"দূর জায়গায় হেঁটে যাওয়াকে ওরা 'হাইক' বলে। আজ ওরা ঐ লাল পাহাড়ের ওপর উঠেছিল।

—"কেন?"

"ঐতো ওদের আনন্দ।"

এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও হেঁটে যেতে চায় না। দাদাকে একথা বলায় বললো, "এখানে এই ছোটো বাড়ীর চারদিকের দেয়ালের ভিতর বন্দী হয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল বৌ। মুক্ত বায়ুতে একটু বেড়িয়ে এলো। স্বাধীনতার আনন্দ পেলো।"

কেন আমি কি আধুনিক নই, আমি কি স্বাধীন নই? দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট বাড়ীর ভিতর আমি তো হাঁপিয়ে উঠি না? এই দেয়ালই তো বাইরের অপরিচিত চোখ থেকে রক্ষা করে আব্রু। শত আধুনিক, শত স্বাধীন হলেও আব্রু নষ্ট করতে পারবো না।—মুখে কিন্তু কিছু বললাম না।

দাদাকে যে বৌ ভালবাসে, একথা জানাতে ওর দ্বিধা নেই। কাল রাতে বাগানে বসেছিলাম, আমি আর বৌ। এটা-ওটা দেখিয়ে সে নাম জিজ্ঞেস কর্ছিলো! অদ্ভুত নাম উচ্চারণ শুনে হাসছিলাম। কিন্তু কি চটপটে মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিচ্ছিল। সে বার বার আস্তে আস্তে আওড়াচ্ছিল, আমি মাঝে মাঝে ভুল শুধরে দিচ্ছিলাম। বেশ মজাই লাগছিল। স্বামী আর দাদা বাগানের আর একপাশে গল্প করছিলেন।

রাত গভীর হয়ে এলো। গাছপালা ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিছুই আর দেখা যায় না। বৌ উসখুস করতে লাগলো, আমার সঙ্গ তার আর ভালো লাগছে না। দাদার দিকে সে বার বার তাকাচ্ছিল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে দাদার কাছে উঠে গেল। দুলবে ওর দেহ, ওর সাদা গাউন যেন ঘন কুয়াশা। বৌ দাদার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কি বললো।

ওমা, আমি তো চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ওসব আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কৌতূহল তো আছে। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলাম। দেখি, দাদার হাতের ওপর গাল দু'খানা রেখে বসে আছে কচি খুকীর মত! দাদা নিশ্চয়ই লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে! হবে না, এ যে নিলাজ কামনার আবেদন। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না আঁধারে। ওদের হাসি-গল্প আর শোনা যায় না। শুধু পোকাদের অবিশ্রান্ত শব্দ।

উঠে চলে এলাম।

স্বামী দেখি বই পড়ছেন। ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, "বিদেশী মেয়েগুলো কি বেহায়া!"

হেসে বললেন, "তোমার কাছে বটে! কিন্তু এই তাদের রীতি শুনছ গো চীনে মাটির পুতুল।"

"সকলের সুমুখে আমি যদি আপনাকে অমন ধারা আদর করি, খুশি হবেন কি ?—ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।

"তুমি অমন করলে বেহায়াপনা হবে বই কি !"—স্বামী বললেন।

রাগ করে কিযে মাথামুণ্ডু বললাম ঠিক নেই !

ওর এই নির্লজ্জতার মানে তো বুঝতে পারিনা বোন, তবু খতিয়ে দেখলে কেন যেন মনে হয় এতে অশোভন তো কিছু নেই। ছেলেপুলে যেমন করে খেলার সাথী খোঁজে, খেলতে খেলতে সোহাগে ভরে দেয় অপরকে এত যেন ঠিক তেমনি। সহজ, সরল, স্বাভাবিক। কোন আড়াল—আবডাল নেই। আমাদের মেয়েদের থেকে কত আলাদা। ওকে দেখে বুনো কমলা ফুলের কথা মনে পড়ে। রং ঝলমল করছে, কিন্তু গন্ধ নেই।

তারা ঠিক করেছে, বৌটি চীনে পোশাকে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করবে। দাদা তাকে আদব-কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। কী মুস্কিল, আমাকে আগে যেতে হবে উপহার নিয়ে।

রাতে ঘুমুতে পারি নি। কি করে যে মার কাছে মুখ দেখাব ?

সাহস করে যে আজ মার কাছে যাব সে তো আশ্চর্য। স্বামী আমাকে খুব সাহস দিয়েছেন, তবু বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন বোন। মার অবাধ্য তো কখনো হইনি, আজ মার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি। কেমন করে এ সাহস পেলাম ? আমি তো ভীরু, কিন্তু এর ভিতরে খারাপ তো কিছু দেখছিনে। তাই দূতী হতে রাজি হয়েছি। কিন্তু মার দিকটাও তো দেখতে হবে। তিনি তো আমাদের দেশের প্রথা মতোই কাজ করছেন।

বিদেশী বৌটির মত যদি ভয়শূন্য হতাম !

———

[ছয়]

বোন,

বড় ক্লান্ত, মনে হয়, এতদিন বুকের বীণার তার বেশ কষে বাঁধা হয়েছিল, আজ সে তার আলগা হয়ে গেছে। সঙ্গীত থেমে গেছে। যে-মুহূর্তের আশঙ্কায় ক'দিন ঘুম হয় নি,—সে মুহূর্ত এলো, চলেও গেল। সবটা বলছি, শোন ঃ

মার কাছে সকালে খবর পাঠিয়েছিলাম, আজ দেখা করতে যাব। লোক এসে বললো, বাবা দাদার আসার খবর পেয়ে টিয়েণ্টসিন চলে গেছেন। তিনি আমুদে লোক! চিরদিনই দেখেছি, কিছু একটা গোলমাল হলে তিনি বাড়ী থেকে সরে পড়েন। মা খবর পাঠালেন, দুপুরে দাদা আর আমি দেখা করতে পারি। বৌয়ের নামই করেন নি। দাদা কিন্তু বললে, "আমি যদি যাই, আমার স্ত্রীও যাবে।"

আমি আগেই রওনা হলাম। ভেট নিয়ে তিনটে চাকর চললো আমার সঙ্গে। দাদা বিদেশ থেকে নানারকম অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছিল! ডালায় সেগুলি সাজিয়ে দিলাম। ঘড়ির গহনাটার ওপর আমার এমন লোভ হচ্ছিল! ওমা, আর একটা কি অদ্ভুত যন্ত্র!—কথা কয়, গান গায়! আলোটাই বা কি চমৎকার—আগুন দিয়ে জ্বালাতে হয় না! আবার যতক্ষণ ইচ্ছে জ্বালিয়ে রাখতে পার। উটপাখীর পালকের পাখাটি কিন্তু ভারী সুন্দর! এক গোছা সাদা পিয়াব ফুল যেন!

বাড়ী যেতেই মা আমাকে হলঘরে ডেকে পাঠালেন। ঢুকে দেখি সাটীনের জমকালো পোশাক পরে মা মিঙ-সম্রাটের ছবির নীচে বসে

আছেন। হাতে অনেকগুলি হীরে, চুনি, পান্না বসানো আঙটি ঝক্‌মক্‌ করছে। এমন সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত কখনো দেখি নি!

অতো সাজলে কি হবে? শরীর আরো জীর্ণ হয়ে গেছে। চোখ রোগ-পাণ্ডুর, ঠোঁটে যেন মৃত্যুর ইঙ্গিত। আঙটিগুলো ঢিলে; হাত নাড়লে বেজে ওঠে। শরীর কেমন আছে, জিজ্ঞেস করবো ভাবলাম, কিন্তু সাহস হলো না। এই সাক্ষাতের জন্য তিনি তৈরী হয়ে আছেন, এখন তো তাঁর মনের জোর দরকার। আমার কুশল প্রশ্নে মনের জোর যদি ভেসে যায়।

ঝুড়ি থেকে একে একে সব জিনিস নামিয়ে তাঁর সুমুখে রাখলাম। মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে তিনি গ্রহণ করলেন। হুকুম দিলেন, জিনিস-গুলো পাশের ঘরে নিয়ে যেতে। যাক্‌, জিনিস নিয়েছেন! এও শুভ লক্ষণ। তিনি যদি না নিতেন, দাদার তো আর কোনো আশাই ছিলনা।

ধীরে ধীরে বললাম, "মা, দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে।"

"আমি তা জানি।"—নীরস, উত্তাপহীন সে স্বর। দমে গেলাম। তবু সবই বলে ফেলা ভালো। বললাম, "বিদেশী মেয়েটিও সঙ্গে আছে।"

মুখের পানে তাকালাম, ভাবলেশহীন সে মুখ। কেমন দমে গেলাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম, "তারা কি আসতে পারে?"

"হাঁ, তোমার দাদা আসুক।"

দাদা আর বৌ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এসে জানালাম, মা দাদাকে দেখা করতে বলেছেন। দাদার মুখে চোখে অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠলো। বৌকে কি বললো। বৌ মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়া মাত্র তার হাত ধরে মার ঘরে ঢুকে পড়লো। মা কি বলবেন? কিন্তু বাধা দেওয়ার সময় পেলাম কই!

আমাদের পিতৃপুরুষের হলঘরে বিদেশী এই প্রথম ঢুকলো। আমি পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদার পেছনে সে যেন ভেসে গেল ঘরের ভিতরে। পরনে তার ভেলভেটের খাটো গাউন; হলদে চুল যেন আগুনের শিখার মত মুখের চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছিল! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু সহবৎ শেখে নি! বেহায়ার মত মার সামনে হাসছে! ড্যাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে আছে! দাদাটা কি শিখিয়ে দেয় নি যে, গুরুজনের কাছে চোখ তুলে দাঁড়াতে নেই? নিজের পায়ে কুড়ুল মারলো দাদা! কিন্তু বউকে কি চমৎকার মানিয়েছে! সে যেন গরবিনী রাজরাণী, রাজমাতার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা বিদেশিনীর পানে তাকালেন, চোখে চোখ মিললো। তাঁরা হলেন পরস্পরের শত্রু। মা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিদেশিনী কি বললো? পরে শুনেছি; বলেছিল: "হাঁটু গেড়ে বসব নাকি?"

দাদা মাথা নাড়লো; দু'জনে মার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো।

দাদা এবার কথা বললো, "মা বহুদিন পরে দূর দেশ থেকে তোমারই আদেশে তোমার কুপুত্র ফিরে এসেছে। এও আনন্দের কথা যে, তুমি আমাদের সামান্য উপহার গ্রহণ করেছ। আমাদের বলছি এই জন্যে যে, আমার স্ত্রী আমার পাশে আছেন। এর কথাই আমি চিঠিতে জানিয়েছিলাম। সে তোমারই ঘরের বধূ। একথা সে জানাতে চায়, বিদেশী রক্তে তার জন্ম হলেও স্বামীর বংশের অনুপযুক্ত সে হবে না। মনে প্রাণে সে চীনে। সে তার জাতির রীতিনীতি ভুলে আমাদের সমাজকে অনুকরণ করছে। তার সন্তান হলে সে হবে এই দেব-প্রেরিত জাতির একজন। মা, মুখ তুলে দেখ, তোমার প্রাপ্য সম্মান তার কাছ থেকে গ্রহণ কর।"

দাদা আর বৌ একসঙ্গে তিনবার প্রণাম করলো। কি আশ্চর্য্য!

বৌয়ের অমন উঁচু মাথা মার পার উপর নুয়ে পড়লো, কিন্তু তখনো সেই মুক্ত, স্বাধীনভাব তো যায় নি? তারপর উঠে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। মা কিছু বললেন না, বলতে পারলেন না। তাঁর শূন্য দৃষ্টি ওদের মুখের উপর পড়লো। তিনি হয়তো তখন বিভ্রান্ত। কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়েনি। তিনি রূপো বাঁধানো নলটা আঁকড়ে ধরে আছেন। তার দৃষ্টি শূন্য হলেও অপলক। চারদিক কি থম্‌থম্‌-ই না কচ্ছিল! ওদিকে স্বামী স্ত্রী নীরব প্রতীক্ষায়। আমার তো মূর্ছা যাবার উপক্রম! হঠাৎ মুখ থেকে ভাবলেশহীন গাম্ভীর্যের আবরণ খসে পড়লো; আনন্দে রক্তিম হয়ে উঠলো মুখখানি। মাতৃস্নেহের কাছে বংশগরিমাকে হারতে হলো তাহলে! কিন্তু কই? আবার তেমনি সাদা হয়ে গেছে। হাত ঝুলে পড়েছে, চোখ নীচু, কেমন যেন হয়ে গেছেন। এবার তিনি বললেন,—"তুমি এসেছ বাবা, এ আমার কত আনন্দ। আচ্ছা যাও পরে দেখা হবে।" মৃদুস্বরে বললেন।

দাদার সন্দেহ হলো। মাকে তাঁর এই উদাসীনতার জন্যে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবে, মনে হলো। ভাগ্যিস্‌, দরজার আড়াল থেকে ইসারায় বারণ করেছিলাম! দাদা বৌকে কি বললে, তার পর প্রণাম করে ফিরে এলো।

মার কাছে দৌড়ে গেলাম। মা কোনো কথা বললেন না। প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে হলো। উঠোন থেকে দেখছিলাম, দু'জন ঝির কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের দিকে চলেছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরে এলাম। কি করবো? ভবিষ্যতে কি হবে, কে জানে।

দাদা আর বৌ সে-দিন অনেক রাত করে বাড়ী ফিরলো। কথা কিছুই হলো না। বাড়ী সুদ্ধ যেন বোবা বনে গেছি!

[সাত]

বোন,

ক'দিন বেশ কাটিয়ে এলে? তিরিশ দিন, না? কেমন কাটলো? নির্বিঘ্নে পৌঁছেছিলে? যাক দেবতাদের ধন্যবাদ, তোমাকে আবার ফিরে পেলাম।

হাঁ, খোকন ভালোই আছে। কেমন মিঠে মিঠে বুলি শিখেছে! অষ্ট প্রহর আধো আধো কথা আর হাসি-কান্নায় বাড়ী মাত করে রাখে। কথা তো নয়, যেন নদীর কল কল ছলছল। ঘুমুলে তবে বাড়ীখানা জুড়োয়! ওর কথা শুনে হাসবারও যো নেই। রেগে দুম্‌দাম্‌ পা ছুঁড়তে থাকে। কি বীর পুরুষ! বাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবার হাঁটে। গোদা গোদা পা নিয়ে ছোটে! কি চমৎকারই না দেখায়!

ওঃ—তুমি দাদার বৌয়ের কথা বলছ? কি আর বলবো, বোন, তারা এখনো মার আদেশের অপেক্ষায় আছে। দাদা তো অস্থির হয়ে উঠেছে, যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে চায়। আমাদের দেশে কিন্তু সেটি হবার যো নেই। কত কথা মৃত্যু পর্যন্ত গোপন থেকে যায়, সময়ের আবার দাম কি? দাদা তো আর শুনবে না, ওকে পশ্চিমি অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে যে! বলছি বোন:—

মার সঙ্গে দেখা হবার পর এক, দুই করে অনেক দিন কেটে গেল, কোনো খবরই আর এলো না। দাদা তো প্রথমে প্রতি মুহূর্তেই খবরের আশা করতো। বউকে বড় বড় প্যাকিঙ্ বাক্সগুলো খুলতে দেয়নি। বলতো, দু-এক দিনের জন্য ওগুলো খুলে লাভ কি! তখন যদি তার অবস্থা দেখতে! কিছুর মধ্যে কিছু না, দাদা হয়তো হো হো করে হেসে উঠলো। কখনো বা গেল চুপ করে। তখন শত কথা বল,

শুনবে না। অষ্ট প্রহর সে যেন কার স্বর শোনার জন্য কান পেতে আছে। অন্য কথা কানে যাবার জো কি!

দিন কাটতে লাগলো। খবর আসার নামগন্ধ নেই। কখনো বা বৌকে, কখনো বা মাকে মন্দ বলতো। আজকাল সাধারণতন্ত্রের দিনে প্রণাম করতে যাওয়া নাকি মূর্খতা! আমি তো শুনে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম; ওমা সাধারণতন্ত্র হয়েছে বলে মা পর হয়ে গেছেন।

বোঝাবে কে বল, যা রেগে আছে! বৌকে বরং ভালো বলতে হয়। সে বলে, প্রণাম করা যদি রীতি, কেন করব না? অবিশ্যি, অমনি করে প্রণাম করা কিন্তু ভালো লাগে না।

বৌটি বেশ শান্ত! দাদার মত হৈ-চৈ করে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। দাদাকে সান্ত্বনা দিতেই সে ব্যস্ত। যখন দাদা রেগে উঠে, বৌ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় বাগানে। একদিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, দাদা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কি বলেছে ওকে। যুক্তি তর্ক মানছে না। বৌ দাদার মুখ খানায় হাত দিয়ে চোখে চোখ রেখে হাসলো। কি বললে তা তো আর শুনতে যাই নি। ওমা, দাদার যত রাগ জল হয়ে গেল!

সব সময় আর কি দাদাকে শান্ত করতে পারে? দাদার কাছ থেকে দূরে সরে যায়—যেন তাকে জানেই না। শুধু মাঝে মাঝে চোখ দুটো চুরি করে তাকায়। এক একদিন রেগে বই খুলে পড়তে বসে। কখনও খোকার সঙ্গে খেলা করে। কি যে সব বলতো খোকাকে, বুঝতামও না!

আমার কাছে বীণা শিখেছে। এখন তো ভালই বাজাতে পারে। ওর গান কিন্তু আমাদের মত মিষ্টি নয়, উগ্রতা আছে। দাদাকে শান্ত করতে হলে ও আজকাল গান গায়। গানের বাণী তো বুঝিনা, কিন্তু যখন শুনি, বুকে এক অন্ধ ব্যথা গুমরে মরে।

বৌ মার কাছ থেকে খবর আসার আশা ছেড়েই দিয়েছে। দেখি কখনো দাদার সঙ্গে, কখনো বা একা বেড়াতে যায়। দাদা কি করে ওকে একা যেতে দেয় ভেবে তো আমি অবাক। মেয়েরা তো পথে-ঘাটে একা চলে না। কিন্তু দাদা কিছু বলে না। একা গেলে ফিরে এসে কি দেখলো সেই গল্প করে। একদিন ফিরে এলো খুব খুশি হয়ে। দাদাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, বাজারে নানা রঙের ঝুড়িতে নানা-রকমের শস্য দেখে এসেছে। এতেই অত খুশি! শহরের দোকানে নানারঙের ঝুড়ি আমরাও দেখেছি, অত খুশি হবার কিছু তো খুঁজে পাই নি! পশ্চিমি মেয়েরা ঐ একরকম। ও নাকি বললে, ফসল যখন ফলে সে সৌন্দর্য আমি দেখেছি। আজ দেখে এলাম তার পরের রূপ। ধূসর মটর ডাল, সাদা তিল, মধু রঙের ময়া হাস, গম……চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। ওদের মিশিয়ে রং যদি তৈরী হয়—আমি তাহলে আঁকতে পারি সবুজ পৃথিবীর ছবি। ওরা বুঝি অমনি করে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। কিন্তু আমাদের কাছে শস্য তো খাবারই জিনিস—কাব্য করবার জন্য নয়। তার জন্যে আছে চাঁদ, তারা, ঝরণা……বেণুবন………

তাই বলে বৌকে ভালোবাসি না, এমন মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। কখনো কখনো ওকে দেখে সুন্দরী বলেও মনে হয়। স্বামীর কাছে নম্র হতেই শুধু জানে না। দাদা কিন্তু চটে না। চীনে-বৌ হলে কি হত?

দাদা বৌ-বৌ করে পাগল। বৌ যখন বই পড়ে, বা আমার খোকনকে আদর করে, দাদা অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকে। বৌ যেন দেখেও দেখে না। দাদার আর তর সয় না! গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়। ওদের ভালোবাসা এত গভীর!

প্রায় বাইশ দিন পরে মার কাছ থেকে খবর এলো, তিনি দাদাকে

ডেকে পাঠিয়েছেন। তবে দাদা যেন একা আসে। চিঠিখানা এত সুন্দর করে লিখেছিলেন মনে হলো, এবারে ওদের দুঃখ ঘুচলো। বৌ আর আমি তো উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

ঘণ্টা খানেক পরে দাদা ফিরে এসে আমাদের ঘরে ঢুকলো, ভারি চটে গেছে, মুখখানা গম্ভীর। সে বার বার বললে, "না, বাপ-মার সঙ্গে থাকা আর ভাগ্যে হলো না।"

অনেক জিজ্ঞেস করতে ঘটনাটা খুলে বললো।

সে মার কাছে অনেকখানি আশা নিয়েই যায়। যে-করে হোক যাতে মায়ে-ছেলেয় মিলন হয়, এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু মা বিরূপ। সে ঘরে ঢুকতেই মা আদর করে বসালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে।"

দাদা শিউরে উঠে বললো, "সেকি, মা! ওকথা বলো না। তোমার যাওয়ার এখনও সময় হয় নি। এখনও নাতির মুখ দেখ নি।"

"নাতি", মা বিড়বিড় করে বললেন, "নাতি! তুমি যদি না দেখাও, কি করে দেখব বল? লীর মেয়ে আমার ঘরের বৌ, এখনো কুমারী।"

তারপর কথা না বাড়িয়ে তিনি লীর মেয়েকে বিয়ে করতে অনুরোধ করলেন। দাদা জানালো, সে বিবাহিত। মা বললেন, বিদেশী পেত্নীকে বউ বলে ঘরে নেবেন না।

দাদা তো এইটুকই বললো। কি জানি আরো কি ব্যাপার হয়।

ওয়াঙ ডা-মা বলে, সে আড়াল থেকে সবই শুনেছিল। কি সে সব কথা বাপু। মা-ছেলেতে অমন কথা হয়—শোনাই যায় না। এ যেন হঠাৎ আকাশে বাজ ডেকে উঠলো। মা যখন দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখালেন, দাদা বলল, "তুমি আজ তোমার ছেলেকে ত্যাগ করছো, কিন্তু বংশরক্ষার জন্য সন্তান প্রসব করবার বয়স তোমার

আছে? তবে, উপপত্নীদের কারো ছেলেকে পুষ্যি নিয়ে বংশরক্ষা কবতে পার। কিন্তু এত নীচে তুমি নামবে মা?"

পাগল নাকি! ছিঃ মাকে এমন কথা বলে।

তারপর দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আঙিনায় নেমে সে নাকি চৌদ্দ পুরুষকে গাল দিতে দিতে বেরিয়ে আসে। আর মার ঘরে তখন সাড়াশব্দটি নেই। ওয়াঙ-ডা-মা নাকি মার কান্না শুনতে পেয়েছিলো। ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখতে পেল, মা দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে আছেন। সেদিনও দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁকে হলঘর থেকে বেরুতে হয়েছিল।

দাদার অন্যায় নয়, মার সঙ্গে এমন ব্যবহাব করা? হাজাব অন্যায় কবলেও তো তিনি মা। বৌটাব ওপর এমন বাগ হয়, দাদাকে যেন হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে।

মাকে দেখবার জন্য ক'দিন থেকে মন কেমন করছিলো। স্বামী বারণ করলেন, দাদার আবাব ডাক না পড়লে আমার যাওয়া হতে পাবে না। দাদা যে আমাদের অতিথি! তাই তো চুপ করে বসে আছি। আর আকাশ-পাতাল ভাবছি বোন।

কাল শ্রীমতী লিউ-ই বহুদিন পবে এসেছিলেন। বাবাঃ, বাড়ীর গুমোট কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দিল যেন। দাদা আর বৌ তো আজকাল চুপ করেই থাকে। আমাকেও বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। দাদা যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। ঘরে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। বই হয়তো একখানা পড়বে বলে তুলে নিলে এক পাতা পড়বার পরই ফেলে দিলে, বৌও দাদার ব্যাপার দেখে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিয়েছে। স্বামী

যখন দুপুরে খেতে আসেন, দাদা আর বৌয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলেন। শ্রীমতী লিউ-ই বেড়াতে এলেন না বাঁচলাম! দু'দণ্ড কথা কয়ে সুখ পাওয়া যাবে। একদিন না, ওঁকেই দেখতে পারি নি?

হাঁ, কি বলছিলাম, শ্রীমতী লিউ-ই তো এলেন। বৌ শ্রীমতী লিউ-ইর দিকে একবার তাকিয়ে আবার বই পড়তে শুরু করলো। আমাদের বাড়ীতে দাদা আসার পর আর কেউ বেড়াতে আসে নি। শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে বৌয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। ভদ্রতা করে দাদার স্ত্রীই বললাম। কিন্তু মা—বাবা স্বীকার না করলে আইনত ওতো স্ত্রী হতে পারবে না। কিছুক্ষণ পরেই ওরা খুব হাসি-গল্প শুরু করলো। ওরা ইংরেজিতে বলতে লাগলো। কি বুঝবো ছাই! কিন্তু বৌ যেন হঠাৎ জেগে উঠলো। ওর দুটো সত্তা আমি দেখেছি। একটি নীরব—সুদূরের একটু বা সে বিষণ্ণ, গম্ভীর—আর একটি চঞ্চল, আনন্দময়। কথায় কথায় লিউ-ইকে আমাদের বিপদের কথা বললাম, উনি গ্রাহ্যই করলেন না। বিদায় নেবার সময় বললেন, "সামান্য বিপদে কাতর হতে নেই। ও তো সবার জীবনেই আসে।" তারপর বৌয়ের পানে তাকিয়ে কি বললেন। বৌ চোখের জল সামলাতে পারলো না। ঘন নীল চোখে চিক চিক করে উঠলো রূপালি জলের ধারা, সবাই চুপচাপ। বৌ হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্রীমতীকে বললাম, "মা তো বিদেশী মেয়েকে বৌ বলে ঘরে তুলবেন না—এই নিয়েই গোল। মার যে কি হবে? রোগে রোগে শরীরে তো কিছু নেই, তার ওপরে আবার এই গোলমাল!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমতী লিউ-ই বললেন: "আজকাল হামেশাই এই হচ্ছে। বৃদ্ধ আর যুবকের মিল হতে পারে না। যুগধর্মে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।"

"এ খারাপ নয় কি ?"—জিজ্ঞেস করলাম।

"খারাপ নয়", তাঁর স্বর শোনা গেল, "এ তো অবশ্যম্ভাবী ফল। পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে আছে বলেই পৃথিবীর এই দুঃখ।"

মার দুঃখ ভুলতে পারলাম না বোন! শ্রীমতী লিউ-ই হয়তো ঠিকই বলেছেন : বুড়োবুড়িদের দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

মাঝে মাঝে শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা মনে হয়। আহা, তাঁরাও তো দুঃখ পাচ্ছেন! খোকনকে দেখিয়ে নিয়ে আসবো।

খোকনকে সাটীনের পোশাক, কালো মখমলের টুপী পরিয়ে দিলাম। ওর প্রথম জন্ম দিনে ওকে ঐ টুপীটা কিনে দিয়েছি। গালে একটু সিঁদুরও দিলাম। এমন সুন্দরই দেখতে হলো আমার খোকনকে! ভয় পেলাম, পাছে সয়তানরা আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়! শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

ওর ঠাকুরমাও তাই ভাবলেন। তিনি ওকে কোলে নিয়ে কত আদর করলেন। ওঁর ফোলা গাল আরও ফুলে উঠলো। মনে ধিক্কার হলো, ছিঃ, এমন করে আমার সোনামণিকে কিনা এঁদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু শ্রীমতী লিউ-ই বলেছেন : এই জগতের নিয়ম, বুড়োদের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর মেলে না।

শাশুড়ী অনেকক্ষণ ধরে খোকার মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ বললেন, "করেছ কি বৌমা, আমার নাতিকে সয়তানের হাত থেকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই কর নি! ওরে কে আছিস, শীগগির সোনার দুল আর ছুঁচ নিয়ে আয়।"

এ কথা কি আর আমি ভাবি নি। ছেলের কানে দুল পরিয়ে মেয়ে বলে সয়তানকে ফাঁকি দিতে হয়—এ কথা মা আমাকে বহুবার

বলেছেন। কিন্তু বোন, খোকার নরম কানে ছুঁচ কি করে বেঁধাই বল? তবে শাশুড়ী-ঠাকরুণকে তো সেকথা বলার সাহস নেই!

শাশুড়ী ছুঁচ নিয়ে কানে বেঁধাতেই খোকন ককিয়ে কেঁদে উঠলো। শাশুড়ীর হাত থেকে ছুঁচ পড়ে গেল। ওকে শান্ত করে একটা সিল্কের সুতোয় গেঁথে দুলটা খোকনের কানে ঝুলিয়ে দিলেন। এইবার খোকনের হাসি দেখে কে!

শাশুড়ী খোকনকে এত ভালবাসেন, আর মার আমার দুঃখ হবে না কেন? দাদা তো লীর মেয়েকে বিয়ে করে এমনি একটি নাতি এনে তাঁর কোলে দিতে পারতো! মার অদৃষ্টই মন্দ! তাঁর জীবন পরিপূর্ণ করে দিতে পারে তার পৌত্র, কিন্তু সে তো এখনও আসে নি। আসবে কিনা কে বলবে। বিদেশী বৌয়ের ছেলে তো আর সে সম্মান পাবে না।

বোন, দেবতারা বুঝি আমাদের ওপর সদয় হয়েছেন। সকালে দাদা মার চিঠি পেয়েছে। মা লিখেছেন, দাদা ও তার বৌ বাড়ীতে আসতে পারে। তবে তার বৌকে সদর মহলে থাকতে হবে। বাবা ও আর আব জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা যা ভালো বিবেচনা করেন, তাই হবে। তিনি মেয়ে-মানুষ, সমাজের কি জানেন?

মার চিঠি পড়ে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। এমন দ্রুত পরিবর্তন কী করে সম্ভব হলো! দাদা হেসে বললো, "এ হবেই আমি জানতাম। মা তাঁর একমাত্র ছেলের উপর রাগ করে ক'দিন থাকতে পারেন?"

বললাম, "কিন্তু বৌকে মা কি ভালো চোখে দেখতে পারবেন?"

"একবার বাড়ীর ফটকের ভিতরে ঢুকুক, দেখিস ওকে সবাই ভালোবাসবে।"—দাদা বললো।

কিছু বললাম না; কিন্তু মনে তো জানি, চীনে মেয়েরা তাড়াতাড়ি কাউকে ভালবাসতে পারে না। আর বাগদত্তা বৌয়ের কথা মনে করে ওকে ভালোবাসা মার পক্ষে সম্ভব হবে কি? সে তো তার অটুট কৌমার্য নিয়ে দাদার জন্যে বসে আছে।

যে চাকরটা চিঠি নিয়ে এসেছিল, তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

সে বললো, কাল রাতে মা প্রায় মরমর হয়েছিলেন। পুরুত এসে সারারাত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছেন, এখন একটু ভালো আছেন। সকালে উঠে নিজের হাতে এই চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

মার এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলাম। রোগের যন্ত্রণায় দেবতাব কাছে শপথ করেছিলেন বোধ হয় যে, ভালো হলেই ছেলেকে ডেকে পাঠাবেন, তার দুর্ব্যবহার ভুলে যাবেন। —তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

মাকে তাহলে মাথা হেঁট করতে হোল! দাদা-বৌয়ের সঙ্গে মিলন হোলো—এতে আমি খুশি, কিন্তু মার এই অপমানের কথাও তো ভুলতে পারছি নে।

স্বামীর কাছে বায়না ধরলাম, মাকে একবার দেখে আসবো।

স্বামী অপেক্ষা করতে বললেন। কি জানি, যদি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন বাঁচানো শক্ত হবে।

বৌয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলাম। ওর ভাষা যদি জানা থাকত তাহলে বলতাম, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর একমাত্র অবলম্বনকে তুমি কেড়ে নিয়েছ, মনে রেখো। ভবিষ্যতে তাঁর দুঃখের কারণ আর হয়ো না।

বলতে পারলাম না। ইংরেজি না জেনে কি মুস্কিলেই পড়েছি!

বোন, আজ দাদা আর বৌ চলে গেছে। ওরা সদরেই থাকবে, মা বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অন্দরে ঢুকতে পাবে না বৌ। এখনো ছেলের বৌ বলে মা মেনে নিতে পারেন নি।

আমাদের বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। ওরা যেন খানিকটা আনন্দ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিমি হাওয়া যেন ওরা, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কি যেন মরে গেল। সে কি উদ্দাম আনন্দ—পশ্চিমি হাওয়া? কে জানে। যাক এবার আমরা একা—খোকা, স্বামী আর আমি। একটু কি আর খুশি লাগছেনা, আবার নিজেদের ফিরে পেলাম।

ওদের কথা ভাবছি। পুরানো বাড়ীর সঙ্গে মিল হবে তো? স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কি আমাদের পুরানো বংশের প্রথা মেনে চলবে?"

উনি উত্তর দিলেন, "বৃদ্ধ আর যুবার মিল হওয়া বড শক্ত।" —এ যেন শ্রীমতী লিউ-ইব কথারই প্রতিধ্বনি। চকমকি পাথরে যেন লোহার ঘসা লাগলো। কে জানে কে কাকে চুরমার করে দেবে।

শুধালাম, "তবু কি হয় বলুন?" গম্ভীর স্বরে বললেন, "আগুন বেরোয়।" স্বামী আরো বললেন, "একজন যুবতী আর একজন বৃদ্ধা যখন একই পুরুষকে ভালবাসে তখন কি যে হয় এক ভগবানই জানেন!"

খোকন মেঝেয় খেলা কচ্ছিল, তিনি কোলে তুলে নিলেন। হঠাৎ তাঁর গম্ভীর স্বর শুনে আঁতকে উঠলাম। তিনি বললেন, "কিউ-ই-লান, ভেবেছিলাম কুসংস্কার তুমি বিসর্জন দিয়েছ।"

"আপনার মা পরিয়ে দিলেন।" —অনেক কষ্টে জড়িত স্বরে বললাম।

"খোকাকে আমরা,' তিনি বললেন, "এই অন্ধ কুসংস্কারের আওতায় মানুষ হতে দেব না।"

পকেট থেকে ছুরি বার করে সুতোটা কেটে ফেললেন। তারপর তুলটা জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "খোকা, তুমি আমার মত হবে। দেখ, আমি তো তুল পবি না। আমরা মানুষ, দেবতাকে ভয় করবো কেন?"

খোকা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ভয় ভাবনা আমাকে ছেয়ে ফেলছে বোন! বাতের অন্ধকারে শুযে শুয়ে ভেবেছি।—বুড়োরা কি এতই বোকা? না, না, দেবতা আছেন বই কি। খোকনের মঙ্গলের জন্য আমি মানৎ করবোই, পূজো দেবই। নারীব কাছে সন্তান যে কি জিনিস, পুরুষ কি বুঝবে?

[আট]

কুড়িদিন মার সঙ্গে দেখা হয় নি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এ ক'দিন শুধু দাদা আর মার কথাই ভেবেছি বোন। স্বামীর কথা মনে হতেই, দাদার ছবি ভেসে উঠেছে। আবার খোকনের কথা মনে হতে মার কথা মনে পড়েছে। মাও খবর দেননি। দাদা আর বৌ বাড়ী গিয়ে কেমন আছে, সে খবরও জানি না। রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবি, মা কি বিদেশী বৌয়ের মুখ দেখেন? উপপত্নীরা, ঝি-চাকররা বৌকে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সন্ধ্যেবেলা কাজের পাট চুকিয়ে ওরা বোধ হয় বৌয়ের চালচলন, চেহারা এইসব নিয়েই গল্প করে। ওরা কেমন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়। মাকেও অনেকদিন দেখি নি। মা একবার ডেকেও পাঠালেন না। কি জানি, রাগই করেছেন বোধ হয়!

দাদা একদিন দেখা করতে এলো। আমি তখন বসে বসে খোকনের জুতোয় জরীর কাজ কর্চ্ছিলাম। বসন্ত-উৎসবের আর দেরী নেই। এমন সময়ে দাদা ঘরে ঢুকলো। চীনে পোশাক পরে দাদাকে ঠিক ছেলেবেলার মত সুন্দর লাগছিল! একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। মুখখানা তো খুব গম্ভীর। কিছু না বলে বসে পড়লো, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিউ-ই-লান, মার বড় অসুখ! আজই দেখতে চল। শুধু তাঁর মনের বল অটুট আছে। তিনি হুকুম দিয়েছেন, আমার স্ত্রীকে একবছর চীনা মেয়েদের মতো থাকতে হবে। আমার সমস্ত উত্তরাধিকার তাঁর উপর নির্ভর করছে

বলে আমরা তাঁর হুকুম তামিল করছি। ওর তো খুব মুসাকিলই হয়েছে। যেন খাঁচায় বন্দী পাখী। তুমি খোকনকে নিয়ে চল।"

সেইদিনই বিকেলে মাকে দেখতে গেলাম। উঠোন পেরিয়ে মার ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখি, দ্বিতীয়া করবী গাছের তলা থেকে আমাকে ডাকছে। 'আসছি' বলে তাড়াতাড়ি মার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রণাম করে মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, স্বাস্থ্য ফিরেছে যেন! শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলে পাছে চটে যান, তাই বললাম, "দাদাকে কেমন লাগছে, মা?"

"তার সঙ্গে", মা বললেন, "দেখাই তো হয় না একরকম। তোমার বাবা ফিরে এলে লীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হবে। দিশী পোশাক পরছে, দিশী খানা খাচ্ছে; তবু ভালো, ভিস্তিওলার মতো দোচোঙা পরে ঘুরবে আমার ছেলে তা আমার সহ্য হয় না। তারপর মতিগতি ফেরাতো দূরের কথা।

বিয়ের কথা উঠতে সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "বিদেশী মেয়েটিকে কেমন লাগলো আপনার?"

"কেমন লাগবে আবার?" মুখ বিকৃত করলেন, "বিদেশীকে যেমন লেগে থাকে। সদরেই আছে; তোমার দাদার পেড়াপীড়িতে সেদিন চা তৈরী করাতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কি গোদা-গোদা হাত, কি চেহারা! সহবতের তো নাম গন্ধ নেই। ওর এখনো অনেক শিখতে হবে। চুলোয় যাক গে। ওর মুখ আর না দেখতে হয় সেই চেষ্টাই করবো। ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট!"

কই দাদা তো একথা বলে নি? হয়তো, মাকে বৌ সন্তুষ্ট করতে পারে নি বলেই বলে নি। বেচারী বৌ! মাকে বললাম, "আমি যদি আমার বাড়ীতে বউকে নিমন্ত্রণ করি, আপত্তি নেই তো মা?"

"না", তিনি উত্তর দিলেন, "যতদিন এখানে আছে বাইরে যেতে

দেব না। মেয়েদের জীবনযাত্রা দেখে শিখুক, আর ও তো রীতি-নীতি কিছুই জানে না। লোকে ওকে দেখে হাসবে আমি চাই না। ও উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, ওকে দাবিয়ে রাখা দরকার। ওর কথা আর আমার কাছে তুলনা।"

আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। মাও বিশেষ কিছু বলতে চান না। সংসারের কথা পাড়লেন। পোশাকের দাম বেড়েছে, চন্দ্রমল্লীর চারা লাগিয়েছেন, হেমন্তে ফুল ফুটবে—এমনি কত কথা। মার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ছোটো গেট দিয়ে বেরুতেই দাদার সঙ্গে দেখা। সে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, "বৌ কেমন আছে?" মৃদু স্বরে বললেন, "না, ভালো নেই। আমরা চলে যাব।—"

ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বিদেশ থেকে যে-দীপ্তি নিয়ে এসেছিল, সে-দীপ্তি নিবে গেছে।

সান্ত্বনার স্বরে বললাম, "একটা বছর তো দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।"

দাদা উত্তেজিত হয়ে বললে, "এক বছর? একদিনও আর সহ্য করতে পারছি না। আমার স্ত্রীও ভেঙে পড়েছে। আমাদের খাবার তার মুখে রোচে না, বিদেশী খাদ্য আনবারও উপায় নেই! তার ওপর এই অবরোধ। সে মুক্ত আলো-হাওয়ার দেশের মেয়ে, সইতে পারবে কেন? রূপোর ফুলদানিতে জল না পেয়ে ফুল যেমন শুকিয়ে যায়, সেও তেমনি শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে, তার কত প্রেমিকের ভিতর থেকে সে আমাকে বেছে নিয়েছিলো। আমি তখন ভেবেছিলাম আমার জাতির এই জিত। কিন্তু কি হাল তার আমি আজ করেছি! দিনের পর দিন সে চুপ করে বসে থাকে। চোখ দুটো তার অসহ্য জ্বালায় জ্বলে।"

পোড়া কপাল, অনেক প্রেমিক ছিল, সে কথা আবার বলছে ! ছিঃ, বেশ্যারও অধম যে ! এমন মেয়ে আমাদের সমান হবে !

নতুন ফন্দী মাথায় এলো। প্রশ্ন করলাম : "ও কি দেশে ফিরে যেতে চায় ?"

এই তো এক উপায় ! বৌ দেশে ফিরে গেলে, দাদা পুরুষ মানুষ, ক'দিন আর ভুলতে লাগবে ? তারপর নীর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করুক !

কিন্তু দাদার সে চোখের দৃষ্টি ভুলতে পারব না ! এই কথা বলা মাত্র জ্বলে উঠলো : "সে যদি চলে যায়, আমিও তার সঙ্গে চলে যাব। আর অনাদরে যদি এখানে তার মৃত্যু হয়, বাবা-মাকে ক্ষমা করবো না, তাঁদের সন্তান বলে পরিচয় দেব না।"

কি যে বলবো ভেবে পেলাম না ! একটু মন্দই বললাম। দাদা কেঁদে ফেললো। তারপর দাদা ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চলে গেল। পেছু পেছু গেলাম।

দেখলাম, বৌ উঠোনে পায়চারী করছে। আবার বিদেশী পোশাক পরেছে—তেমনি ঘন নীল গলা-খোলা গাউন ; হাতে বিদেশী বই। ও পায়চারী করছিল। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছিল, আমাকে দেখেই হাসলো। দু-একটা কথা বললাম, এখন ও চীনে ভাষা বেশ বলতে পারে, তবে আমাদের মতো সুন্দর উচ্চারণ হয় না। কিছুক্ষণ বসেছিলাম ; খোকনকে রেখে এসেছি, তাড়াতাড়ি উঠতে হলো। চলে আসবার সময় বৌ বললো, খোকনকে দেবে বলে কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করছে। খোকনকে একদিন নিয়ে আসতেও বললো। তারপর কথা গেল ফুরিয়ে। এবার বিদায়ের পালা। আমাদের মধ্যে যে সাগর বিছিয়ে আছে, কি করে ওদের দুঃখ ঘোচাবো গো !

যখন বিদায় নিয়ে চলে আসছি, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে

কেঁদে ফেললো। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আবার শীগ্‌গিরই আসবো। একটু ম্লান হাসলো। আহা, বনের পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখেছে গো।

বছর কাটতে চলেছে, বোন! বাবা দেশে ফিরে এসেছেন। দাদার বৌকে নাকি খুব ভালবাসেন! ওয়াঙ-ডা-মার কাছে শুনেছি, বাড়ী ফিরে এসেই প্রথমে তিনি দাদার বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়েই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

দাদার ঘরে ঢুকেই বললেন, "কই, তোমার বিদেশী স্ত্রী কোথায়?" বৌকে ভালো করে দেখে বললেন, "বাঃ, বেশ দেখতে তো, চীনে কথা বলতে পারে তো? তা মন্দকি! পবিবারে নতুন জিনিষের আমদানি হোলো।"

দাদা অসন্তুষ্ট হয়েই ছিল, বললো "সবে শিখেছে।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন, "তা প্রেমের কথা ইংরেজিতে মন্দ শোনাবে না, কি বল?"

বৌ বুঝতে পারে নি, খুব খুশি হলো। তড়বড় করে বললে ও আবাব আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না। আহা বেচারী! এসে অবধি একটা মিষ্টি কথা শোনে নি! দাদা বুঝিয়ে দিলে, খুশি হবার কোনো কারণ নেই। বাবা বৌকে অপমান করেছেন!

ওয়াঙ-ডা-মা বলে, বাবা নাকি বৌয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। দাদা কিন্তু বৌকে কখনো বাবার কাছে একা ফেলে যায় না। বৌ যা ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না।

কাল বৌকে দেখতে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছ, বৌ ?"

হেসে বললো, "আগের চেয়ে ভালো। ওর মা সেই যে চা করতে ডেকেছিলেন, তারপর আর তাঁকে দেখি নি। ওর বাবা রোজই আসেন। বেশ লোক !"

হাসলে বেশ লাগে। বিষণ্ন গম্ভীর মুখ যেন কালো মেঘ—তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সূর্যের আলো।

"এমন একদিন আসবে", বললাম, "যখন মাও তোমাকে ভালো বাসবেন।"

ওর স্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো : "কেন এখন তিনি ভালোবাসতে পারেন না ? আমার অপরাধ, ভালোবেসে তাঁর ছেলেকে বিয়ে করেছি, এই তো ? না, এ বাড়ীতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। ওর বাবাই আমাকে একমাত্র ভালোবাসেন। দেখ, দেখ, সব নির্বোধের মত তাকিয়ে আছে। সঙ্ দেখছে যেন ! ওদের জ্বালায় আমি পাগল হব।"

দেখলাম, উপপত্নীরা আর ঝিগুলো ভিড় করছে। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"ওরা কি দিনরাত আমার কথাই আলোচনা করবে ?"—ঝাঁঝালো স্বরে বললো।

"ওরা তো বোকা। ছিঃ, ওদের কথায় রাগ করতে নেই।"—বললাম।

"না, আমি একদণ্ড ওদের সহ্য করতে পারি না।"—বৌ বললো।

ঘরখানা বিদেশী কেতায় সাজিয়েছে, দেখলাম। দেয়ালের চারদিকে বড়বড় ছবি আর ফোটোগ্রাফ টাঙানো। কিন্তু ঘরের সে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এ যেন বড় বিদেশী—বড় অদ্ভুত। ওর স্বর শুনে ফিরে তাকালাম। একটা ফোটোগ্রাফ দেখিয়ে বললো, "এই আমার বাবা, এই মা, এই বোন।"

"ভাই নেই বুঝি?"—জিজ্ঞেস করলাম।

"না, তোমাদের মত ছেলে ছেলে করে আমরা পাগল হয়ে উঠি না। মেয়েই বা কম কিসে?"

ওর স্বর শুনে অবাক হলাম। কি জানি বোন, মেয়েতো মেয়ে, দুঃখ সইতেই তার জন্ম। সে হবে বেটাছেলের সমান! কি জানি! যাকগে, এবার ছবি দেখতে লাগলাম।

বৌয়ের বাবাকে দেখলাম, সাদা দাড়িওলা বুড়ো, চোখ দুটিতে ওরই মতো ঝড; নাকটা খাড়া, টাক মাথা।

বৌ বললে, "উনি যে কলেজে পড়ান, তোমার দাদা সেখানে পড়তেন। ওখানেই আমাদের প্রথম পরিচয়। বাবার ফোটো যেন এ আবহাওয়ায় মানায় না। যেমন মানায় না আমাকে। ঐ যে মা। বাবাকেই কিন্তু বেশি ভালোবাসি।"

এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়েছিল এবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার চেয়ে কত লম্বা বৌ। তারপর কি ভেবে আবার গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। এবার টেবিলের উপর থেকে কতগুলি সাদা কাপড় নিয়ে সেলাই করতে লাগলো। সেলাই করতে কখনো তো দেখি নি। আঙুলে কি একটা পরেছে, আর ছুঁচ ধরেছে দেখ না, যেন ছুরি!

কিছু বললাম না, ওর মার ছবিতে মন দিলাম। বেশ ঢল ঢল মুখখানি, দয়া মায়া চোখে যেন ফুটে উঠেছে! চুল অমন বিশ্রী করে ছাঁটা কেন? ওর বোনেরও তাই। মেয়েটা কিন্তু ভারি কচি, আর খুব হাসিখুশি বলে মনে হয়।

বললাম, "মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, বৌ?"

"না", সংক্ষেপে উত্তর দিল। "চিঠিও লিখি না।"

"কেন?" অবাক হলাম।

"ভয় হয়। তিনি বড় বুদ্ধিমতী! চিঠিতে যতই লুকোই না কেন,

আমার এই অবস্থা তিনি ধরে ফেলবেন। বাড়ীর আর সবাই এই বিয়েতে খুব খুশি হয়েছিল। আমার ছোট বোন তো ভাবলে, এমন রোমান্স আর হয় না। আমিও যে তা ভাবি নি তা নয়। তোমার দাদার মতো প্রেমিক তো আমি দেখি নি। ও এমন করে কথা বলতে পারে, মনে হয় যেন প্রতিটি কথা এক নতুন রূপে, নতুন মানে নিয়ে দেখা দিয়েছে। ভালবাসাই যেন নিত্য-নতুন হয়ে দেখা দেয়। মা কিন্তু আশঙ্কা করেছিলেন। তাই এখানে এসে ওঁকে একখানাও চিঠি দিই নি।"

"কিসের আশঙ্কা?"—প্রশ্ন করলাম।

"তিনি বুঝেছিলেন, বিদেশীকে বিয়ে করে শান্তি পাব না। আমার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনরা বিষিয়ে তুলবে আবহাওয়া। আজ তো দেখতে পাচ্ছি, অশান্তির বেড়াজাল আমার চারদিকে তৈরি হচ্ছে। মা'র আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। রাতে ভয়-ভাবনায় ঘুম আসে না। এই উচুঁ দেয়ালের গণ্ডিতে বন্দী হয়ে আছি। তোমাদের দেশের লোকগুলোকে দেখে অজানা সন্দেহ মনে ঘনিয়ে আসে। সবাই যেন মুখোশ পরে রয়েছে। তাদের বুঝতে পারা দেবতারও অসাধ্য।

স্বামীও যেন এই দলেরই একজন। আমাদের দেশে থাকতে তো এরকম দেখি নি। একটা রহস্য যেন তাঁকে সাধারণের ওপরে সম্মান দিয়েছিল, আজ দেখছি তিনি সাধারণ, অতি সাধারণ। তাঁর মুখও মুখোস। কি তার অনুভূতি তার প্রকাশ নেই। কি বলব বোন। বলে তো বোঝানো যায় না। সহ্য হয় না বোন, সহ্য হয় না, তোমাদের মুখ নীচু করে থাকা, তোমাদের পদে পদে দাস মনোবৃত্তি। আমার দেশের সে উদারতা, সে উচ্ছলতা কোথায়? একদিন স্বামীকে প্রেমে গদগদ হয়ে বলেছিলাম, প্রেমের জন্যে আমি চীনে বনে যেতে পারি, আমি হতে পারি

হটেনটট বা জুলু। সে ভুল আজ ধরা পড়ে গেছে। আমি আমেরিকা, আমি আধুনিকতা, জীর্ণ সংস্কারের পুজো আমাকে দিয়ে হবে না।"

ওর অন্তর-নিরুদ্ধ জ্বালা যেন উপচে পড়লো। কিছুটা নিজের ভাষায়, কিছুটা আমাদের ভাষায়। ভ্রূ কুঁচকে গেল, হাত দুলছে, সমস্ত মুখখানায় যেন বিদ্রোহ। এত কথা বৌ বলতে পারে, ভাবি নি কোনদিন। হঠাৎ পাথরের ফাটল থেকে যেমন নেমে আসে জলের ধারা—এও যেন তাই। অর্ধেক কথাই বুঝতে পারি নি, তবু বৌয়ের প্রতি করুণায় মন ভরে গেল।

ওকে কি বলে সান্ত্বনা দেব এই কথাই যখন ভাবছি। এমনি সময় দাদা এসে ঘরে ঢুকলো। আমাকে যেন দেখতেই পায় নি। বৌয়ের হাত দু'খানি, গালে, চোখে মুখে চেপে ভাঙা স্বরে বললো,

"মেরী, মেরী, তুমি এমনি করে বলবে—আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি না একদিন বলেছিলে, আমার জাতি হবে তোমার জাতি, তমি হবে চীনের সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ? এই এক বছরে যদি সে পরিবর্তন সম্ভব না হয়, আমরা আবার আমেরিকায় ফিরে যাব। না হয়, কোনো অচেনা অজানা দেশে গিয়ে উঠবো। দু'জনে দু'জনকে নিবিড় করে পাব সেখানে! নতুন বংশাবলী সৃষ্টি করবো। মেরী, আমার ভালোবাসায় তোমাকে সন্দিহান হতে দেব না।"

নিজের ভাষায় এমন সুন্দর করে দাদা বললো! ইংরেজিতেও কি বললো! মেরী দেখি, দাদার কাঁধের ওপর মাথা রেখেছে! ওর মুখে হাসি। বুঝলাম দাদার জন্যে এর চেয়ে বেশি ও সইতে পারবে। বেরিয়ে এলাম। ভালবাসার নগ্ন প্রকাশ আমাদের সংস্কারের বাইরে। চোখে ভাল লাগে না।

বাইরে এসে দেখি, সবাই হাঁ করে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বাবার

উপপত্নীদের তো আর সামনা সামনি কিছু বলতে পারি না। তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে দাসীদের ধমক দিলাম। হাঁ করে কি দেখছে ওরা! উপপত্নী কেক চিবুতে চিবুতে বললো, "সঙ্—বিদেশী পেত্নীটা একটা সঙ্! তা সঙ্ তো লোকে হাঁ করেই তাকিয়ে দেখে গো।"

"আমাদের মত সেও মানুষ। তারও আছে অনুভূতি।"—উত্তর দিলাম।

শুনে তারা হেসেই খুন!

রেগে-মেগে তো চলে এলাম। ওমা, কখন যে বাড়ী এসে পৌঁছেছি টেরই পাই নি। দেখ দিকি কাণ্ড—কোথায় বৌয়ের উপর রাগ করব, তা না, এখন বৌকে ভালই লাগছে। ওর পক্ষে দাঁড়াতে রাজি—রাজি—রাজি।

[নয়]

বোন,

যা আশা করি নি, তাই হলো। বৌয়ের গর্ভে সন্তান। ও আগেই টের পেয়েছিল, দাদাকে বলে নি। দাদা আজ বলে গেল।

এ সংবাদে আনন্দ হওয়া তো দূরের কথা, মা বিছানা নিয়েছেন, ক'দিন আর ওঠেন নি। তুমি তো জান বোন, বংশরক্ষার জন্য একটি ছেলে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছেলে যে বিদেশিনী তাঁকে উপহার দেবে, তা ছিল ধারণার অতীত! না পারবেন তিনি নাতিকে কোলে বসিয়ে আদর করতে, না হবে তাঁর বংশরক্ষা!

মার কাছে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই ফিরছি। দেখলাম, চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে আছেন। আমাকে দেখে চোখ মেলে একবার তাকালেন। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। হঠাৎ মুখের রং বদলে গেল। ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ভয় পেয়ে ওয়াঙ্-ডা-মাকে ডাকলাম। দেখি, ওয়াঙ্-ডা-মা একটা আফিমের নল নিয়ে ছুটে এসেছে। মা নলটা টেনে সুস্থ হলেন।

ও কপাল, আফিমের নেশা! আমি ভেবেছিলাম, মূর্ছা গেছেন! বৌয়ের সম্বন্ধে কথা বলতে যাব, উনি চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন বিরক্ত করো না!"

আর কিছু বললেন না। আর কিছুক্ষণ বসে থেকে মাকে প্রণাম করে ঘর থেকে চলে এলাম। ঝি চাকরদের আস্তানার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওয়াঙ-ডা-মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ওয়াড-ডা-মা বললে, "এমনই রোজ হয়। আজকাল রোগে শোকে আরো বেড়ে গেছে। মনে খুব লেগেছে! দেখলে না, শেকড়-কাটা গাছের মতো একেবারে লুটিয়ে পড়েছেন?' মুখে কেমন বুড়োটে ভাব এসে গেছে। আর বেশি দিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না।"—সে নীল ঝাড়ন দিয়ে চোখ মুছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

আমি জানি, তিনি কিসের আশায় বেঁচে ছিলেন। আজ তো সে আশা নির্মূল হয়ে গেল। এমনি ভাবতে-ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। তারপর স্বামীকে সব কথাই বললাম। অনুরোধ জানালাম একটি বার যদি মাকে দেখতে যান। অতো বড়ো ডাক্তার তিনি!

তিনি বললেন, তাঁকে রাগিয়ে দিলে তো আরো খারাপ হবে। সুযোগ পেলেই ডাক্তারে কথা পাড়বে, তখন আমাকে নিয়ে যেয়ো।

স্বামী ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে।

বাবা মেরীর ছেলে হবে শুনে খুব খুশি। বললেন, "আমাদের আর একটি খেলার সাথী বাড়লো কি মজা!"

দাদা বাবার এই উচ্ছ্বাস বরদাস্ত করতে পারলো না। বাবাকে সে আজকাল ঘৃণা করে। আমি সবই বুঝি।

মেরী কিন্তু তার সমস্ত দুঃখ ভুলে গেছে। একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইছে। গানের মানে জিজ্ঞেস করতে বললে, এ হচ্ছে ছেলেদের ঘুম-পাড়ানী গান। ঘুম-পাড়ানীই বটে! শুনতে শুনতে আমারই চোখ জড়িয়ে আসছিল। মেরী আর দাদা আবার নতুন করে প্রেমে পড়েছে যেন। এখন কি আর মান-অভিমানের পালা গাইবার সময় আছে? সন্তান আসছে যে!

সন্তানটি কেমন হয় দেখতে হবে! না, আমার খোকনের মতো

এমন সুন্দর হবেই না! মেয়েও হতে পারে। মেরীর মতো যদি হলদে চুল হয়? দাদা মেয়ে নিয়ে কি করবে?

দাদা বড় অসুখী! চীনে আইনের চোখে মেরীকে স্ত্রী বলে প্রমাণ করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। বাবা কিন্তু আমোলই দিচ্ছেন না। হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন, অন্য কথা পাড়ছেন। সামনের ভোজে দাদা নাকি জ্ঞাতিদের সুমুখে তার ছেলের উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করবে। মেয়ে হলে অবিশ্যি কোনো কিছুই হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো আর বলা যায় না!

বছর এগারো মাসে পড়লো। বরফ পড়তে সুরু করেছে। বাঁশ-গাছ ঢেকে গেছে বরফে; বাতাসের দোলায় সমুদ্রের সাদা ঢেউ বলে মনে হয়। মেরীর গর্ভে সন্তান বাড়ছে, আর আমাদের বাড়ছে আশঙ্কা। মার বাড়ীতে তো প্রতীক্ষার অস্থিরতা। কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা? তাইত ভাবি বসে বসে।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম, তাই ভাবলাম দুঃস্বপ্ন তো দেখি নি। কই, স্মৃতি মন্থন করে তো পেলাম না স্বপ্নের হদিশ। বাইরে তাকালাম। শীতের ধূসর আকাশ; শ্রীহীন গাছগুলো। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা এ জীবনের মানে কি। আমরা তো দেবতার হাতের পুতুল। ভয় ছাড়া আমরা কিই বা করতে পারি!

মন তো মানে না। দিন যতই এগিয়ে আসছে, ভয় ততই বাড়ছে। কিন্তু কার জন্যে ভয়? তাই তো আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছি। আমার খোকনের জন্যে? না, না, সে তো সিংহ শিশু, কি তার দাপট! রাজার মতো সে হুকুম দেয়, সবাই তো তটস্থ। এক

ওর বাবাই ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন। আমি? আমি তো ওর বাঁদী আর ও তা জানেও। সব জানে পাজি—বদমাসটা! না, না বোন, খোকনের জন্তে ভয় নয়। কিন্তু বিপদ যে আসছে আকাশ থেকে নেমে। দেবতারা কবে তার জানান দেবেন কে জানে।

মার শরীর আরো ভেঙে পড়েছে। বাবার টিয়েণ্টসিনে চলে যাওয়া উচিত হয় নি। পুরুষ তো! বাড়ীর বিপদ, মার অসুস্থ শরীর সব ভেসে গেল, তিনি চললেন আমোদ করতে। তিনি যে পরিবারের কর্তা, সে-কথা ভুলে গেছেন।

তাঁকে চিঠি লিখতে ভয় ভয় করছে। কি জানি, চটে যান যদি! বাড়ী এসে হয় তো বলবেন, এমন কিছু হয় নি যাতে করে তাঁকে চিঠি দিয়ে আনানো হয়েছে। কিন্তু বিপদ যদি নাই আসবে, আমার ভয় করছে কেন? কেন এই উদ্বেগ?

স্বামীকে লুকিয়ে কোয়াঙ্-ইনকে পূজো দিলাম। স্বামী তো শুনে হাসবেন। বেটা-ছেলেদের ঐ তো কাজ! সুখের দিনে দেবতাকে তুচ্ছ করা যায় কিন্তু দুঃখের দিনে দেবতাই আমাদের আশ্রয়। একদিন কোয়াঙ-ইনের কৃপায় আমার খোকনকে পেয়েছিলাম।

বারো মাসে পড়লো বছর। মা সেই যে বিছানা নিয়েছিলেন, আজো ওঠেন নি। অনেক অনুরোধের পর তিনি ডাক্তার ডাকতে রাজি হলেন। শহরের বড় হাকিম চ্যাঙ্ এসে দেখে বললেন, ভয় কি, সেরে যাবে। চল্লিশ ভরি রূপো তাঁর দর্শনী। মনটা একটু সুস্থ হলো।

কবে যে সেরে উঠবেন, কে জানে! এখন তো আফিম খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকেন। মুখের রঙ হলদে হয়ে গেছে। কত বলেছি,

স্বামীকে ডাকিয়ে বিদেশী ওষুধের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু রাজি হন নি। প্রাণের ভয়ে বিদেশীর ওষুধ তিনি খাবেন না। স্বামীকে একথা বলেছি। উনি তো রেগে বললেন, মরতে বসেছেন, এখনও কুসংস্কার!

এ যাত্রা মা বোধ হয় আর টিকবেন না।

মা—আমার মা।

দাদা পরিবারের কেউ নয়। কারো সঙ্গে কথা বলে না, শুধু বসে ভাবে। বৌকে মাঝে মাঝে আদর করে। অনাগত সন্তানকে নিয়ে ওরা ওদের জগত তৈরি করেছে। সেখানে কারো ঢুকবার অনুমতি নেই।

সেদিন বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, ঘরের সুমুখে বাঁশের বেড়া দেয়া। উপপত্নীরা রাতদিন হাঁ করে থাকে বলে এই বন্দোবস্ত। মার কথা দাদাকে বললাম, দাদা ক্ষেপে গেল। মাকে ক্ষমা করতে সে পারবে না, মা ক্ষমার অযোগ্য। জীবনে চেয়ে না পাওয়ার দুঃখ প্রথম দিলেন মা, তাঁকে ক্ষমা করবে কেমন করে।

অনেক দিন মাকে দেখতে যায় নি। অনেক বলতে রাজি হলো। মার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মা একবার চোখ মেলে চেয়ে আবার চোখ বুজলেন।

দাদা বেরিয়ে এসে মার সম্বন্ধে কোনো কথাই বললো না। তাঁর রোগাতুর মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখে দাদা চমকে গেছে বোধহয়! সে ভেবেছিল, মা তার মুখ দেখতে চান না, তাই আর ডেকে পাঠান নি। অভিমান গলে গেল। ওয়াডা-ডা-মার কাছে শুনেছি, ও রোজই এক পট চা দিয়ে আসে মাকে। মা কথা বলেন না। ওর বিদেশী বৌয়ের কথা কি মা ভুলতে পারেন? তার আবার গর্ভে সন্তান!

দাদা বাবাকে চিঠি লিখেছিল। তিনি কাল আসছেন।

মা আজকাল কথা বলেন না। সারাক্ষণ ঘুমে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু এমন ঘুম তো আর কখনো দেখি নি। সেদিন চ্যাঙ্ এসে বললেন : দেবতারা যদি মারেন, আমি আর কি করতে পারি ?— এই বলে দর্শনী নিয়ে চলে গেলেন। স্বামীকে অনুরোধ করলাম। আজ কাল তো আর চোখে দেখতে পান না যে চিনবেন। উনি এসে একটিবার যদি দেখে যান। স্বামী দেখতে এলেন। মাকে তিনি এই প্রথম দেখলেন।

এত বিচলিত হতে তাঁকে কখনো দেখিনি। বহুক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শিউরিয়ে উঠছিল তার দেহ। তারপর তিনি দূরে সরে এলেন, সে কি, অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাকি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, আর উপায় নেই। তারপর আর একবার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, "ঠিক তোমারই মত দেখতে। মনে হয়, তুমিই যেন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছ।"

কাঁদলাম। উনি রুমাল বার করে চোখ মুছিয়ে দিলেন।

আজকাল রোজই মন্দিরে যাই। খোকাকে কোলে পেয়ে দেবতাকে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই বুঝি মার অসুখ হলো! দেবতার দুয়ারে মদে মাংসে ষোড়শোপচারে পূজা দিলাম। দেবতা মুখ তুলে চাইবেন কি ? হে দীর্ঘায়ুর দেবতা, মাকে দীর্ঘ জীবন দাও। তোমার মন্দিরে আমি একশো টাকা দেব !

পাথরের দেবতা মুখ তুলে চাইলেন না। পর্দার আড়ালে পাথরের

বেদীর উপর বসে রইলেন। কি জানি, আমার প্রার্থনা শুনলেন কিনা! আমার ষোড়শোপচারে পূজা ব্যর্থ হোলো।

আমাদের জীবনের আড়ালে দেবতাদের ষড়যন্ত্র চলছে। তারা নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর!

বোন, বোন! দেবতারা জানালেন তাঁদের নির্দেশ। মা মারা গেছেন। তুমি খোকন আর আমার সাদা পোশাক দেখে বুঝতে পার নি?

রাতে মার কাছে ছিলাম। কি চেহারাই হয়ে গিয়েছিল। ব্রোঞ্জের পাতের মত বিছানায় লেগে ছিলেন; কথা বলা বা খাওয়ার শক্তি ছিল না। তিনি তখন নিয়তির নির্ঘোষ শুনেছেন, তার বুকের ধুকধুকানি থেমে যাবার শুধু অপেক্ষা। ভোর হওয়ার একটু আগে তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হলো। দাদাকে ডেকে পাঠালাম। দাদা ঘরে ঢুকে দেখেই বললে, "শেষ হয়ে এসেছে। বাবাকে কেউ ডাকুক।"

ওয়াঙ্-ডা-মা মার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ওকেই বাবাকে খবর দিতে পাঠালাম। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম বিছানার পাশে।

মা হঠাৎ উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন যেন! হাত দুখানা তুললেন—যেন কত ভারী বোঝা বইছেন। তারপর নামিয়ে রাখলেন। বোঝা বওয়া শেষ, তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়লেন।

বাবা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে এলেন। ওকে সব কথাই বললাম। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি মাকে চিরদিন ভয় আর ভক্তি করেছেন। এবার কেঁদে বললেন, "উনিও আমাকে ছেড়ে চললেন!"

দাদা তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলো। ওয়াঙ্-ডা-মাকে বলে গেল, বাইরে মদ নিয়ে যেতে। মদে তলিয়ে মার দুঃখ ভুলবেন বাবা!

আমি মার পাশে বসে রইলাম। মৃত মা, মুখের রেখায় রেখায় মৃত্যুর কাঠিন্য। মাকে যেই যা বলুক, আমি তাকে ভালো করে জানতাম। বাইরে রাগী হলেও ভিতরে তিনি ছিলেন খুব কোমল। তাই তো এত কাঁদছি। পর্দা টেনে দিয়ে ওঁর দেহ আড়াল করে দিলাম। উনি নিরিবিলি ভালবাসতেন। মৃত্যুর পরও তেমনি থাকেন। আহা—বেচারী মা!

তাঁর দেহে নানা সুগন্ধ মাখিয়ে, সিল্কের জামা পরিয়ে দিলাম। কর্পূর কাঠের তৈরি কফিন বাবা আর মার জন্যে আগেই তৈরী হয়ে আছে। তারই একটা নিয়ে আসা হোলো। মাকে কফিনে পুরে দিয়ে চোখের পাতার ওপর রাখলাম তাঁর প্রিয় হীরে, চুণী, পান্না। এবার কফিন বন্ধ করে দেওয়া হোলো। দৈবজ্ঞ পাঁজি দেখে বললেন, নতুন বছরে ষষ্ঠী শুভদিন—ঐ দিন তাঁকে কবর দেওয়া হবে। পুরুতরা মিছিল করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। শোকের বাজনা বাজছিল। ষষ্ঠী পর্যন্ত মার দেহ ঐখানেই রাখা হবে।

দেবতাদের চোখের ওপর শত শতাব্দীর সঞ্চিত স্মৃতির ভিতর তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন। পৃথিবী তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারবে না। তাঁকে হয়তো জাগাবে প্রদোষের আলো আর আঁধারে পুরুতদের মন্ত্রের ধ্বনি, মন্দিরে ঘণ্টা দীর্ঘ বিরতি দিয়ে বেজে বেজে যাবে।

মা—আমার মা। তোমাকে ছাড়া তো আর কারো কথা ভাবতে পারি না।

[দশ]

বোন,

চার মাস কেটেছে। এই দেখ, শোকের সাদা সুতো এখনও চুলে পরে আছি। মার জন্যে এখনও কাঁদি। আবার ভাবি, তিনি মরে জুড়িয়েছেন, নইলে আরো কত সইতে হত! তোমাকে বলছি সব।

মার দেহ নিয়ে চলে যেতেই বাবার উপপত্নীদের ভিতর, কে বাড়ির কর্ত্রী হবে,—এই নিয়ে ঝগড়া বাঁধলো। সবাই কর্ত্রী হতে চায়, মার মত লাল সাটীনের পোশাক পরতে চায়! লাল সাটীনের পোশাক ওরা পরতে কখনো পায়নি, তাই আর সবুর সইছে না। মরবার পর এমনি জাঁক করে সদরের বড় ফটক দিয়ে তার মৃত দেহ নিয়ে যাবে, কে না চায় বলো? তা' জান না বুঝি? উপপত্নীরা মরলে তাদের খিড়কি দিয়ে নিয়ে যায়। তাদের আবার সম্মান কি? থাক্, ওকথা। —উপপত্নীরা বাবার মন ভোলাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো।

সবার কথাই বুঝি বলেছি। না—লা-মে নয়। ওর কথা ভুলেই গিছলাম।

লা-মে এখানে ছিলো না, প্রায় বছর ঘুরতে এলো সে গেছে, আর ফেরে নি। সে আছে আমাদের জমিদারীতে। বাবা আর একটি উপপত্নী গ্রহণ করবেন শুনে, সে নিজের কোনো খোঁজ-খবর দেয় নি। মার মৃত্যু সংবাদ লিখতেই সে এলো। মন্দিরে মার কফিনের ওপর পড়ে সে কি কান্না! তিনদিন দাঁতে কুটোটি কাটে নি। খবর পেয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছি।

একেবারে বদলে গেছে লা-মে। কোথায় গেছে তার সেই চঞ্চলতা, সেই হাসি, সেই রঙীন বেশ-ভূষা? গালে, ঠোঁটে আজকাল আর রঙ্

মাখে না। ঠোঁটে এখন আর জেল্লা দেয়না। কিন্তু এখনো ঠোঁটের কোণে ঘৃণার ভাবটুকু আছে। উপপত্নীদের ঝগড়ার কথা আমার কাছে শুনে ঠোঁট দুটি কোঁচকালো। ওসব নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই। বাবার নামও মুখে আনলো না। শুনেছি, লা-মে প্রতিজ্ঞা করেছে, বাবা তার কাছে এলে সে বিষ খাবে। তার প্রেম চলে গেছে, ঘৃণা সে জায়গা জুড়ে বসেছে। ভালবাসা টকে গিয়ে ঘৃণার রূপ নিয়েছে।

দাদার বিদেশী বৌয়ের কথা বলতেই বরফের মত ঠাণ্ডা অথচ তীব্রস্বরে বললো, "প্রকৃতি তো সব ঠিক করে বসে আছে। অমন লোকের ছেলে আবার ভালো হয় নাকি? এখন মেয়েটির রূপ আছে, তোমার দাদার আছে কামনা, ভালবাসবেই। সন্তান হোক, বিদেশী বৌয়ের চেহারা থেকে সৌন্দর্য চলে যাক, মলাট খোলা পুঁথির মতো হোক ওর চেহারা—দেখি কেমন ভালোবাসা থাকে! তখন বৌয়ের মনে শত প্রেম থাকলেও, তোমার দাদার প্রেম কি বাঁচবে? দাদা পুরানো পুঁথি আর আর প্রেমের পাঠ নিতে চাইবে না। নতুন খুঁজবে।"

বুঝলাম, আঘাত খেয়ে ওর কোমল প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বাড়ীতে চারদিন ছিল। শুধু বসেই থাকতো চুপচাপ। সে চঞ্চলতা চলে গেছে। ওর রাগেও যেন উত্তাপ নেই। সে চলে গেলে স্বামীকে তার কথা বললাম। স্বামী আমার হাতখানা হাতের মুঠোয় পূরে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন,—

"বুক-ভরা প্রেম উপেক্ষিত হলে সব মেয়েদের এই দশা হয়। প্রেম প্রতিদান চায়, কিউ-ই-লাম, যদি না পায়, ভয়ংকর কিছু করতেও সে পিছোয় না।"

তাইত প্রেম কি ভয়ানক হয়ে ওঠে যখন ওর ধারায় এসে দেখা দেয় বাধা—হৃদয় থেকে হৃদয়ে যখন সে বয়ে যায় না।

না-মের কি হোলো জিজ্ঞেস করছো বোন? সে আবার আমাদের জমিদারীর নিরালায় চলে গেছে। আসবেনা—শহরের সমাজের পাদ-প্রদীপের আলোয় তাকে আর দেখা যাবে না।

কে কর্ত্রী হবে—এই নিয়ে গোলমাল চলতে লাগলো। দাদার স্ত্রীর অধিকার, কিন্তু সমাজের বিচার না হলে কিছুই হবার উপায় নেই। বাবা মাঝে মাঝে দাদার বিয়ের কথা তুলছেন; কিন্তু দাদা গ্রাহ্য করছে না। এদিকে মীদের বাড়ী থেকে আসছে বিয়ের ঘন ঘন তাগাদা। তারা আর ফেলে রাখতে রাজি নয় বিয়েটা; দাদা অস্থির হয়ে উঠেছে। জীবন জটিল সমস্যাভরা। তবে একদিক দিয়ে তার পূরণ হচ্ছে তাদের ভালবাসা।

মা মরবার পর দাদা আর বৌয়ের প্রেম আরো যেন গাঢ় হয়েছে। দাদা বলে, সেই নাকি মার অকাল মৃত্যুর কারণ; বৌ তাকে শান্ত করে, সন্তানের কথা বলে।

কী চালাক মেয়ে! মার উপর তো এত রাগ ছিলো, কিন্তু দাদা যখন মার স্নেহের কথা বলে কাঁদে, বৌ সান্ত্বনা দেয়।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের ঘরেই তারা বসে থাকে। বেড়াতে গেলে, কথাও বলে, আদর যত্ন করে; কিন্তু বুঝতে পারি, ওরা আত্মগত হয়ে আছে। এক মুহূর্ত দু'জন দু'জনকে চোখের আড়াল করতে চায় না।

বিয়ের আগে এমন কাণ্ড দেখলে বিতৃষ্ণায় মন ভরে যেত।—মনে হত, এমনধারা ভালোবাসা রক্ষিতাতেই সম্ভব। আমাদের ঘরের মেয়েরা হ্যাঙলাপনা করবে কেন? আজ আর তা মনে হয় না। স্বামী আমাকে ভালোবাসার শাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলেছেন। আমিও

তো স্বামীর জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উনি দু'দণ্ড ভালো করে কথা বলবার সময় পান না, এমনি কপাল!

ওরা বেশ আছে। শুধু ভবিষ্যতের জন্য ওদের প্রতীক্ষা। কি হবে?

বৌ সুখী হয়েছে। পরিবারের কেউ নয় বলে তার দুঃখ নেই। সন্তান তার গর্ভে, সেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এখন সে আমাকে বলে।

"আমার ছোট খোকা আমাকে শেখাবে। তার কাছে শিখবো, স্বামী আর তার বংশগৌরব কি করে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। আর তো আমি নিঃসঙ্গ নই। আমার মত সুখী কে?"

আবার দাদাকে শোনায়: তোমার পরিবার আমাকে ঘরের বৌ বলে মানুক আর নাই মানুক—তোমার রক্ত, মজ্জা আমার দেহে ঢুকেছে, আমরাই তোমার দেশের একটি খুদে মানুষ প্রসব করব।

দাদা সাময়িক তৃপ্ত হয়, কিন্তু তার মনে দেশের রীতিনীতির বিরুদ্ধে, বাবার বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। আমাকে মাঝে মাঝে বলে, "আমরা না হয় একরকম করে জীবন কাটিয়ে দেব, কিন্তু সন্তান? তাকে তার প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার আমাদের অধিকার নেই।"

আমি মেয়ে মানুষ কি বলবো, বল?

বৌ আসন্নপ্রসবা। দাদা বাবাকে গিয়ে বললো, "মা তো নেই,

আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে এসেছি।" দাদার মুখেই শুনেছি।

বাবা তাঁর খাস কামরায় বসে মদ খাচ্ছিলেন। দাদা গিয়ে হাজির হোলো। রূপোর পাত্র থেকে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন, "বল।" দাদা বললো, "আমার স্ত্রী আজ তার প্রাপ্য সম্মান দাবি করছেন। পশ্চিমের আইনে আমরা বিবাহিত; তিনি আমার স্ত্রী। চীনের সমাজের চোখেও আমার স্ত্রী সেই সম্মান পেতে চান। আমার সন্তান তার গর্ভে, তাই এখন সে সম্মানের বিশেষ প্রয়োজন।"

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "পশ্চিমের ফুলটি বড় সুন্দর! শুনে সুখী হলাম, সে তোমাকে একটি সন্তান উপহার দেবে। বসো, দাঁড়িয়ে কেন।"

টানা থেকে মদের বোতল বার করে দাদাকে একপাত্র ঢেলে দিলেন। দাদা খেল না।

মৃদু হেসে বললেন, "ও, তুমি তো আবার খাও না! আচ্ছা তাড়াতাড়ি কি? তোমায় কথা ভেবে দেখব। তোমার মা চলে গেলেন সেদিন, কিছুতেই আর মন বসাতে পারছি না। ভাবছি, সাঙ্হাই গিয়ে কিছুদিন থাকবো। ভেবে ভেবে কি শেষে অসুখ হবে? তোমার স্ত্রীকে আমার আশীর্বাদ জানিও। তার একটি পদ্মের মত খোকা হোক। আচ্ছা।"—তিনি হাসতে-হাসতে পাশের ঘরে চলে গেলেন। পর্দা টেনে দিলেন।

দাদা তো ফিরে এসে বাবাকে যা নয় তাই বললো। আমরা না ধর্মগ্রন্থে পড়েছি, বাপ-মার চাইতে স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসলে পাপ হয়? কিন্তু ভালোবাসা পাপ-পুণ্য মানে না। এতো জ্ঞানী হয়েও শাস্ত্রকাররা একথা বুঝতে পারেন নি। দাদাকে দুষতে পারি না কিন্তু।

বৌও একথা শুনে চটে আগুন! মার অপমানেও এত চটে নি। বললো, "ভেবেছিলাম, উনি বুঝি আমাকে স্নেহ করেন। ভণ্ড, পশু কোথাকার।"

গুরুজনদের গালাগাল দেয়, এ কেমন বৌ গা? ভাবলাম, দাদা নিশ্চয়ই মন্দ বলবে। দাদাটা মাথা নীচু করে রইলো। বৌ দাদাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, "চলো, আমরা এমন সর্বনাশা জায়গা ছেড়ে চলে যাই।"

আমি তো অবাক, বোন! দাদা বৌকে টেনে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। আমি চলে এলাম। কিন্তু বুকখানা তো ওদের জন্যে ব্যথায় ভরে গেল। আহা, বেচারীরা! কি হবে?

———

[এগার]

বাবা অবশেষে তাঁর মতামত জানালেন। কঠোর সে মতামত, কিন্তু মিথ্যে আশায় বসে থাকার চেয়ে তো ভালো। এক জ্ঞাতি-ভাইকে দিয়ে সাংহাই থেকে খবর পাঠিয়েছেন। তিনি কাল হলঘরে চায়ের টেবিলে দাদাকে বললেন :

"তোমার বাবা তাঁর মতামত আমাকে বলে পাঠিয়েছেন, সমাজপতিরাও তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি বলেছেন, বিদেশিনীকে তাঁর বংশের বধূ বলে গ্রহণ করতে পারেন না। তার শিরায় শিরায় অপবিত্র বিদেশী রক্ত বইছে। তার সন্তানকেও তিনি বংশধর বলে স্বীকার করতে পারেন না। তাঁর মতে সংকর রক্তে যার জন্ম, সে পৃথিবীর কলঙ্ক। তাঁর পূজায় পিতৃপুরুষরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাঁরা চান, এমন সন্তানের পূজা, যার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ রক্ত বইছে।"

তিনি একটু থেমে একটি থলি বার করে বললেন, "তোমার বাবা অবিবেচক নন। তিনি একহাজার টাকা পাঠিয়েছেন, সন্তান প্রসবের পর বিদেশী পেত্নীকে একহাজার টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। সে চলে গেলে লীর মেয়েকে বিয়ে করো। লী এই আপদ বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা তোমার ক্ষ্যাপামি চলে যাবার অপেক্ষায় বসে আছেন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে—কেলেঙ্কারী কম হয়নি—কিন্তু তবু তারা চুপ করে ছিলেন। কিন্তু আর তো পারেন না। যৌবন চলে যাচ্ছে, যৌবনের সন্তানই তো শ্রেষ্ঠ সন্তান। আপদ চুকিয়ে দাও, শীঘ্রই বিয়ে করে সন্তানের পিতা হয়ে বংশ রক্ষা কর।"

—এই বলে থলিটা দাদার হাতে দিলেন। দাদা ছুঁড়ে ফেলে দিল টাকার থলি! তার চোখদুটো দু'মুখো ছুরির ফলার মত চক্‌চক্ করে উঠলো। দাদা চিৎকার করে বললো, "নিয়ে যান টাকা। আমার বাবা নেই, আমার বংশমর্যাদা নেই। ইয়াঙের ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমি লজ্জিত হচ্ছি! আমি আর এক মুহূর্ত আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় থাকবো না। আমরা এই পুরানো সমাজকে ভেঙে সেখানে নতুনের সৃষ্টি করবো।"

দাদা বেরিয়ে গেল। জ্ঞাতিটি টাকার থলি নিয়ে সাঙ্‌হাইয়ে বাবার কাছে গেলেন।

আগে বলেছিলাম বোন, মা মরে বেঁচেছেন। মা এসব কথা শুনলে পাগল হয়ে যেতেন। আজ তাঁরই বংশে উত্তরাধিকারী হবে কিনা উপপত্নীর ছেলে!

দাদা একেবারে নিঃসম্বল হলো। তার অংশ থেকে লী-পরিবারের ক্ষতি পূরণ হবে। ওয়াঙ-ডা-মা সেদিন বললে, লী-রা সম্বন্ধ দেখছে। দাদা শেষে ভালোবাসার জন্য সর্বস্ব হারালো।

দাদা বৌকে জানায় নি, কি জানি যদি গর্ভের সন্তানের কিছু হয়। শুধু বৌকে বললো, "চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। এই দেয়ালের ভিতর বন্দী থেকে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে।"

বৌ আনন্দে সম্মতি জানালো। দাদা পিতৃপুরুষের ভিটে জন্মের মত ছেড়ে দিল। তাকে বিদায় দিতে কেউ এলো না। ওয়াঙ্‌-ডা-মা ওকে প্রণাম করে বিদায়ের সময় বললে, "আমার কর্ত্রীর ছেলে বাড়ী ছেড়ে চললো! তিনি ভাগ্যবতী, স্বর্গে গেছেন। আমাকে রেখে

গেলেন শেষে এই দেখতে ? এই দেখবার আগে আমার মরণ হলো না কেন ?"—বুড়ি অঝোরে কাঁদলো।

দাদা আর বৌ আমাদের মতোই ছোটো একটা দোতালা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। সাঁকোর রাস্তার কাছে বাড়ীটা। দাদা যেন কেমন ঝুড়িয়ে গেছে, আর তেমন করে কথাটি কয় না। একেবারে চুপচাপ। দু'মুঠো ভাতের জন্যে দাদাকে গভর্মেণ্ট স্কুলে পড়াতে যেতে হয়। বেচারি। আগে তো ভোরে উঠতেই পারতো না। একদিন বললাম, "বাপের ভিটে ছেড়ে পস্তাচ্ছ না তো ?"

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না।"

দাদা মার মতই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ও তো বাবার মতো নয়। ও প্রকৃতই মার ছেলে।

বোন,

কাল রাতে কি মজা হয়েছে শোনো! যখন শুনি, তখন তো হাসি পাচ্ছিল। তারপরে কেন যেন চোখে জল এল। কাল অনেক রাতে দাদা দরজার কড়া নাড়বার শব্দ পেয়ে খুলে দিতে গেল, দেখে ওয়াঙ-ডা-মা একটা মস্ত বাঁশের বাক্স আর একটা পুঁটলি নিয়ে হাজির। দাদাকে সে বলল, "আমি এখানে থাকতে এসেছি। আমার মনিবের নাতিকে আমি ছাড়া কে পালন করবে ?"

দাদা বললে, "কিন্তু আমি তো ওঁদের বংশের নামে পরিচিত হতে চাই না ? আমাব মা-বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।"

"কি," ওয়াঙ্-ডা-মা চিৎকার করে বললে, "তুমি ওকথা বলছো। বাপের সঙ্গে সব চুকে যেতে পারে, কিন্তু মার সঙ্গে এখনও চোকে নি। বুড়ি ওয়াঙ্-ডা মা এখনো বেঁচে আছে, সে তোমাকে যেমনি করে পালন করেছিল, ঠিক তেমনি করে তোমার ছেলেকেও পালন করবে।

ছেলের কাছে ঠাকুরমার গল্প করবে। তার বাপের বাড়ীর গল্প করবে আমি যা বলছি তাই হবে।"

দাদা কি উত্তর দেবে? আমার মার বাপের বাড়ীর ঝি—আমাদের দুধ-মা। দাদা চুপ করে গেল। পোঁটলা-পুঁটলি বাড়ীতে রেখে রিকসা ভাড়া চুকিয়ে দিলে। এখন ওয়াঙ-ডা-মা দাদার বাড়ীতে জাঁকিয়ে বসেছে।

মার অগাধ ভালোবাসা ওকে তাঁর ছেলের কাছে টেনে এনেছে। দাদা আর বৌ ওকে পেয়ে খুব খুশি! দাদার ছেলে দাদারই মতো ওয়াঙ-ডা-মার হাতে মানুষ হবে।

আজ সকালে ওয়াঙ-ডা-মা আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। ওর ভাবগতিক দেখে মনে হয় ও খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওর পক্ষে খাপ-খাওয়ানো ভারী শক্ত। কত বড় বাড়ীতে ও থেকেছে। এত এক ফোঁটা বাড়ী! সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে উঠতে যায়, কিন্তু ভয় যে পায়—তা তো বুঝি। তবু দেখান চাই এ যেন ওর আজন্ম অভ্যেস। কিন্তু তবু মার প্রতি ভালবাসা ওকে এখানে টেনে এনেছে।

বাপের বাড়ীর খবরও দিয়ে গেলো। প্রথমা উপপত্নীই এখন কর্ত্রী। পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলকের সুমুখে জ্ঞাতিরা তাকে বাবার স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। অহংকারে মাটিতে নাকি পা পড়ে না! শুনলাম, লাল সাটীনের পোশাক পরে, দশ আঙুলে দশটা আঙটি দিয়ে বাড়ীতে ঘোরে, আর হুকুম চালায়। মার ঘরখানাও নাকি দখল করেছে। এসব শুনে কি আর বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে হয়?

/

দাদা বৌয়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলো। যে বিলাসে, ভোগে সারা জীবন কাটিয়েছে সে কিনা আজ গরীব হয়ে গেল। কিন্তু দাদা তবু হার মানে নি। বৌকে সে আরো বেশি করে ভালবাসে এখন!

আজ দাদার ওখানে গিয়েছিলাম। ফিরতি মুখে তোমার এখানে। দাদা আর বৌ বেশ আছে! ওদের বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, বৌ

চিঠি লিখছে। আমাকে আর খোকনকে দেখে উঠে এলো। বললে, "মার কাছে এতদিন পরে চিঠি লিখছিলাম, বোন। আর বাধা নেই। মা পড়ে খুব খুশি হবেন। ঘরখানা একবার ভালো করে দেখ, কিছু পরিবর্তন হয় নি? এই দেখ, জানলায় হলুদ সিল্কের পর্দা, ফুলদানিতে নার্সিসাস ফুল সাজিয়েছি, খোকার ঘুমোবার জন্য একটা আপেলফুল রঙের সিল্ক দিয়ে বিছানা তৈরি করলাম। সবই আমার খোকার জন্যে।" খুশিতে ওর মুখ ঝলমল করে উঠলো। কথা যেন বৌয়ের ফুরোতেই চায় না।

মেঘে ভরা আকাশের নীচে ধূসর উপত্যকা দেখেছ, বোন? হঠাৎ মেঘ সরে গেলো; সূর্য হাসলো—উপত্যকার বুকে সুরু হলো রঙের খেলা। বৌ যেন সেই উপত্যকা। ওর চোখ আনন্দে জীবন্ত, কথা তো নয়, যেন গান।

এতদিন ওর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। আজ কিন্তু মনে হলো ও সুন্দরী, ও অপূর্ব! চোখে আর ঝড়ের আভাস নেই—সমুদ্রের নীল জল যেন সূর্যকিরণে টল টল করছে।

দাদারও অস্থিরতা চলে গেছে, এখন সে খাঁটি পুরুষ।

যখন ভাবি, এরা প্রেমের জন্য দেশকে ত্যাগ করেছে, সমাজকে ত্যাগ করেছে, মাথা এদের কাছে সম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে। এমন ভালবাসা তো দুর্লভ। এদের সন্তান, সে হবে পৃথিবীর বিস্ময়।

ওদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সে, কি পূবে, কি পশ্চিমে—কোথাও তো ঠাঁই পাবে না। কেউ কি তাকে বরণ করে নেবে? তাকে নিজের জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। বাপ-মার মতো মনের জোর থাকলে সে তা পারবে। সে দু'জাতির মিলন ঘটাবে। মেয়ে মানুষ, এ সব বড় বড় কথা মাথায় ঢোকে না। স্বামীকে জিজ্ঞেস করবো। তিনি তো জ্ঞানী। দেখি, তিনি কি বলেন!

কিন্তু একটি কথা বুঝি বোন, মন ওদের, সন্তান হবে ওদেরই। বিপ্লব সে ঘটাবে।

[বারো]

বৌ রাতদিন গান গায়, ওর হৃদয়ের আনন্দ সুরের পথ বেয়ে ঝরে পড়ে। আমি তো ছেলের মা, ওর আনন্দের খবর রাখি; ওর ছেলের জন্য দু'জনে বসে চীনে পোশাক তৈরি করি; মাঝে মাঝে কাপড়ের রঙ পছন্দ নিয়ে বৌ গোলমালে পড়ে। বলে, "খোকার চোখ যদি কালো হয়, এই লাল পোশাকটা তাকে পরাবো, বোন কিন্তু যদি ধূসর হয়, তা হলে তো বেগুনী পোশাকই মানাবে ভাল!" আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, বোন, খোকার চোখ দুটি কেমন হবে!"

হেসে উত্তর দিই, "তোমার কি মনে হয়?"

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে বৌ। পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে বলে, "ওর বাপের মতো কালোই হবে। লাল কাপড়টাই নিই, কি বল?"

বলি, "ঐ তো আনন্দের রঙ, ছেলেদের মানায় ভাল।"

পোশাক তৈরি করছি, কাপড়ের ওপর ফুল তুলছি আমরা দু'জনে। খোকার জুতায় জরী দিয়ে বাঘ আঁকা হয়েছে। ঠিক আমার খোকনের মতো। এখন তো আর ওকে পর ভাবি না। ও আমার বোন। নাম ধরে ডাকতেও শিখেছি! মেরী! মেরী!

চীনে পোশাকের পর বৌ বিদেশী পোশাক তৈরি করেছে। কি সাধাসিধে আর সুন্দর! জরী বসিয়ে জবরজঙ করে নি, লেস বসিয়েছে। কাপড়ও চমৎকার, কুয়াসার মতো হালকা আর সাদা!

শুধোলাম, "এ পোশাক খোকাকে কখন পরাবে?"

হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "সপ্তাহে ছ' দিন খোকা ওর বাবার, তখন ও চীনে পোশাক পরবে। সাতদিনের দিন আমি ওকে

পুরোদস্তুর সাহেব সাজিয়ে দেব। তখন ও আমার। প্রথম ভেবেছিলাম, পুরোপুরি চীনে করেই তাকে মানুষ করবো। এখন দেখছি, আমার দেশের সঙ্গেও তার যোগসূত্র রাখা দরকার। পৃথিবীর দু'দেশের রক্তে তার জন্ম, সে দু'দেশেরই ছেলে!"

হাসলাম। এমন না হলে কি বৌ দাদার মন পেতো!

বৌয়ের একটি খোকা হয়েছে। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। ওয়ার্ড-ডা-মার কোল থেকে খোকাকে নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম! কি স্বাস্থ্য! পশ্চিম থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য, আর পূব থেকে পেয়েছে কালো চোখ, রেশমের মতো কালো চুল। সব থেকে অবাক হলাম, মুখে আমার মার আদল দেখে। বৌয়ের কাছে বলি নি, বোন। দেখে কিন্তু দুঃখ আর আনন্দ দুই-ই হল। খোকাকে নিয়ে গিয়ে বৌয়ের কাছে বসলাম। বললাম, "ছোট্ট এই গ্রন্থিটুকু দিয়ে পূব ও পশ্চিমকে তুমি বেঁধেছ!" বৌ হাসলো। ক্লান্তি আর আনন্দে ভরা সে হাসি। বললে, "খোকাকে আমার বুকের ওপর দাও!"

খোকা মার দুধের মত সাদা বুকের ওপর শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে লাগলো। বৌ ওর কালো চুল নাড়তে লাগলো সাদা আঙুল দিয়ে।

হেসে বললাম, "ওকে তো লাল পোশাকই পরাতে হবে। বেশ কালো হয়েছে।"

"ওর বাবার মত হয়েছে, তাতে দুঃখ তো নেই বোন, বরং আনন্দ।" বৌ উত্তর দিল।

দাদা আসতেই আমি বিদায় নিলাম।

কাল রাতে আমার খোকার ঘরে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরে জ্যোৎস্নায় আলোয় আলো হয়ে গেছে! আমাদের ফালি বাগানটুকু দেখাচ্ছে যেন কালো সাদায় আঁকা ছবি। গাছগুলি আকাশ মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাতায় পাতায় রুপোলি আলোর ঝিকিমিকি। বাতাস বইছিল আস্তে আস্তে।

আমাদের পেছনে খোকা বাঁশের দোলনায় ঘুমুচ্ছিল। আজকাল বেশ বড় হয়েছে! দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তারপর দাদার খোকার কথা কেন যেন মনে পড়লো। ও তো মার মতোই দেখতে হয়েছে। মা চলে গেছেন, তাঁর রূপ যেন ওর মধ্যে রেখে গেছেন। আস্তে আস্তে স্বামীকে বললাম, "দাদার খোকা তো বিচ্ছেদের ব্যথা নিয়েই জন্মালো। একদিকে ওর মা, তার দেশ, তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো; অন্যদিকে ওর বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি তার বাবাকেও ত্যাগ করলো, বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করলো!"

স্বামী হাসলেন, "আজ আর ওকথা ভেব না, কিউ-ই-লান। শুধু চেয়ে দেখ, বিভিন্ন দু'টি নর ও নারীর প্রেম তাকে পৃথিবীর আলো দেখালো। সে হলো তাদের যোগসূত্র। পুব আর পশ্চিমের যুগার্জিত সংস্কার নিয়ে ওর বাপ-মা দু জনেই জন্মেছিল; খোকা কিন্তু তাদের সংস্কার চূর্ণ করে দিয়েছে। এ এক অপূর্ব মিলন, সমন্বয়।"

তিনি এমনি করে আমাকে আগেও বলতেন। পুরোনো সংস্কারের নাগপাশ কেটে আমাকে তিনি উদার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছেন।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "আমরাও চাই না আমাদের খোকার মনে জাতিগত অন্ধসংস্কার বদ্ধমূল হোক। তাকে আমরা জীবনের পথে উৎসাহ দেব সংস্কার চূর্ণ করতে, নতুনের স্বপ্ন দেখতে।"

ভেবে দেখলাম বোন, স্বামীর কথাই ঠিক।

—সমাপ্ত—